# ভক্তির মহাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

## বেদান্তের বরফ বিগলিতঃ

মানবের বিশ্বযাত্রা ভগবানেরই মানবরূপের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। জীবনের পথের প্রতিটি পর্বের হয়ে চলেছে ভাগবতী অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। ঋষিগন যে বেদ বিজ্ঞান পেয়েছেন বেদমাতা সরস্বতীর কাছ থেকে সরাসরি উপলব্ধিতে জেনেছেন ভগবানই হয়েছেন এই জীব জগৎ সবই। ভগবানের এই বিশ্বপ্রকাশ অংশমাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে বারবার। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ সত্যকে পূর্ণতায় প্রকাশ করেছেনঃ "জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও সব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।

আমার মা কালীঘরেদেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন।দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়! প্রতিমা চিন্ময়! –বেদী চিন্ময়! –কোষা কুশী চিন্ময়! চৌকাট চিন্ময়! মার্বেলের পাথর-সব চিন্ময়!

ঘরের ভিতর দেখি সব যেন রসে রয়েছে! সচ্চিদানন্দ রসে।

কালীঘরের স্নমুখে একজন দুষ্ট লোককে দেখলাম; কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি স্বলস্বল করছে দেখলাম!

তাইত বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন বিড়াল পর্যন্ত!.....

তাঁকে লাভ করলে এইগুলি ঠিক দেখা যায় তিনিই জীব, জগৎ, চর্তুবিংশতিতত্ব হয়েছেন।"

(শ্রীম, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, দক্ষিনেশ্বরে, ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৩।)

যা কিছু প্রকাশ ও বিকাশ হয়েছে বিশ্বময় সবই ব্রহ্মজাত। ভগবানের এই বিকাশ ও প্রকাশ এই সৃষ্টির পর্বে পর্বে ঘটেছে। সৃষ্টির আদি সময় থেকে হয়ে চলেছে ভগবৎ বিকাশ। এই প্রকৃতির সবপ্রকাশই ভগবানেরই নিজ বিকাশ। এই বিকাশ সর্বত্র পরম্পরায় বিধৃত হয়ে রয়েছে জীবনের সব অঙ্গন হয়ে উঠেছে প্রকাশ রূপ। এই প্রকাশ রূপই ভগবানের প্রকৃত পরিচয়। তিনিই সব হয়েছেন। তিনিই স্বয়ংহয়েছেন এই আলোকরূপ। তিনিই সূর্য; তিনিই চন্দ্র; তিনিই নক্ষত্রাদি; তিনিই বিদ্যুতের ক্ষণমাত্রার আলোক আবার এই তিনিই হয়েছেন অগ্নি প্রকাশ। তিনি জ্যোতির্ময়। জগৎ মাঝে যত জ্যোতি রয়েছে এ পর্যন্ত, তিনি সে সবই। তিনি স্বয়ং হয়েছেন জীবন; জড়; সব পদার্থ। তিনি প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন রত্ন প্রকাশ; তিনিই ধাতব প্রকাশ। তিনিই হয়েছেন দৃঢ় পাথর, হয়েছেন সব বস্তুকণা। তিনিই জল রূপে প্রাণকে গড়ে দিয়েছেন ক্রম বিকাশে জীবনের পর্বে পর্বে হয়েছেন সব জলকণা। তিনিই এই মাটির শরীরে হয়েছেন পৃথিবীর পার্থিব প্রকাশ। আবার সেই তিনিই বায়ু রূপে অন্তরীক্ষে হয়েছেন স্বতঃ বিরাজমান। তিনিই সব প্রাণীর প্রাণ; জীবনের মাঝে জীবাত্মা; কোষে কোষে তিনি জীবনের স্বতঃ অস্তিত্ববান। তিনি জীবনের আদি-মধ্য-অন্ত। তিনিই রয়েছেন দ্রষ্টা হয়ে সাক্ষী হয়ে জীবনের অভ্যন্তরে। যদিবা কভু জীবন করেছে বরণ তাঁকে তিনিই হন মূর্ত স্বতঃ স্ফুর্ততায়।

মহর্ষি ভৃগু তাঁর দেবপিতা ও দেবগুরু বরুণের কাছে উপস্থিত হয়েছেন তখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য। অধীহি ভগবে ব্রহ্ম ইতি- আমাকে উপদেশ শিক্ষা দিন ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে। জানতে চাই ব্রহ্ম কী। বরুণ বললেনঃ

যত! বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।

যৎ প্রয়ান্তি অভিসংবিশন্তি। তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব। তৎ ব্রহ্ম ইতি।। (তৈ.উ.৩/১/১)

যে পূর্ণ সত্য হতেই সব জীবন জাত হয়; যার কৃপায় সব জীবন কালের পথে এগিয়ে চলে আর যার দ্বারা পরিগৃহিত এই জীব চেতন অন্তিমে ফিরে যায় আদি উৎসমূলে আর সেখানেই যায় বিলোন হয়ে তাঁকেই জানতে প্রয়াস কর- তিনিই ব্রহ্ম।

ভৃগুর সত্যলাভের এই পথে একান্ত সহায়ক হয়ে বরুণদেব বললেনঃ

অন্নং-প্রাণং-চক্ষুং-শ্রোতং-বাচম্ ইতি। ভৃগুকে বুঝিয়ে বললেন বরুণ-অনু-প্রাণ-চক্ষু-কর্ণ-মন-বাক্-এগুলির সবই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি এই সামগ্রিক সত্যের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপলব্ধিকে অনেকে বর্ণনা করেছেন বেদান্তের সত্য উদ্‌ঘাটন রূপে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিতে বেদান্ত-ভক্তি-শক্তি-যোগ-তন্ত্র-মরমিয়া সবই একাকারে মিশে গিয়েছে।

বেদান্তের দৃষ্টিতে তিনি পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশ হয়েছেন জগতের সর্বত্র হয়ে বিস্তৃত। নানারূপে নানাভাবে তিনিই করেছেন নিজেকে মূর্ত। তিনিই এই সবকিছুরই আদি-মধ্য ও অন্ত। তিনি স্বয়ং হয়েছেন বহু ব্যাপ্ত ও বিকশিত। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে উদ্দেশ্য করে বললেন

'যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি নিলির্প্ত। তাঁতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতর তিন গুণ আছে-সত্ব, রজঃ তমঃ। যিনি শুদ্ধ-আত্মা তাঁতে এই তিন গুণ রয়েছে, অথচ তিনি নির্লিপ্ত। আগুনে যদি নীল বড়ি ফেলে দাও, নীল শিখা দেখা যায়, রাঙা বড়ি ফেলে দাও লাল শিখা দেখা যায়। কিন্তু আগুনের আপনার কোন রঙ নাই।

শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত। আর শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাকলে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না।

যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনিই মহাকারণ-কারণের কারণ। স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ, মহাকারণ। পঞ্চভূত-স্থূল। মন বুদ্ধি অহঙ্কার সুক্ষ্ম। প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি সকলের কারণ। ব্রহ্ম বা শুদ্ধ আত্মা কারণের কারণ।

এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ।

জ্ঞান কাকে বলে? এই স্ব-স্বরূপকে জানা আর তাতে মন রাখা। এই শুদ্ধ আত্মাকে জানা।'

(শ্রীরামকৃষ্ণ, দক্ষিনেশ্বর মন্দিরে, ২রা অক্টোবর, ১৮৮৪)

শ্রীরামকৃষের জগৎ পরিচয় গড়ে উঠেছে বেদান্তের বেদীতে। জগতের কাছে একদিকে তাঁর সমন্বয়ী রূপ আর অন্য দিকে বেদান্তিক রূপ হয়ে রয়েছে প্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা ভগবানের কথা বলে গিয়েছেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকতে অথবা পরবর্তীতে যখনই যে কেউ এসেছেন তিনি অন্য বিষয়ের অবতারণা করতে দেননি। অন্য যে কোনও বিষয়কে পাশে সরিয়ে দিয়েছেন সর্বদা। অন্য প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে ঈশ্বর তত্ব বা ঈশ্বর প্রসঙ্গ করেছেন সব সময়ে। প্রতিটি আলোচনা, প্রতিটি সাক্ষাতে সবাই তাঁর কাছ থেকে প্রেরণার শক্তি সংগ্রহ করেছে। যে চেয়েছে ভগবানের পথে এগিয়ে যেতে তার জন্য স্বতই ভাগবতীর প্রেরণার শক্তি ও ভাগবতী প্রেরণার আগ্রহ সৃষ্টিকারী তত্ব তিনি উপহার দিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে।

ইতিহাসের পথচলায় সমগ্র মানব সভ্যতায় প্রাধান্য পেয়েছে শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ, দাপট ও পরিনতি। পাশ্চাত্যের সভ্যতা বড় বেশি করে প্রাধান্য দিয়েছে হিরোয়িজম্‌কে। ব্যক্তি মানুষের বড় হয়ে ওঠার নানান মাপকাঠির মধ্য থেকে ফুটে উঠেছে শক্তিমান হয়ে ওঠা। আলেকজান্ডার ইতিহাসের পটে দাগ কেটে গিয়েছেন তাই শুধু নয়, আলেকজান্ডার তার যুদ্ধক্ষমতা আর শক্তির তীব্রতার দ্বারা জগতের মাঝে একটা নির্দিষ্ট প্রভাব বলয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যে প্রভাব বলয় তখন তৈরী হয়েছিল তার মূলে সমগ্র মানব জাতির জাগরণের জন্য ফুটে উঠেছিল নির্দিষ্ট কোন তত্ব যেটিকে ব্যক্ত করা যায়-'হিরোয়িজম্‌ ইজ আল্টিমেট'- শক্তিই প্রয়োগ ক্ষমতাই শেষ কথা বলে থাকে। এই মনোভাবের প্রতিফলন পরবর্তীতে ডারউইন ও তার পরবর্তীদের মধ্যেও ফুটে উঠেছে-'সারভাইবাল অব্‌দি ফিটেষ্ট' – যে পারবে বিজয়ী হতে জীবন যুদ্ধে তারই হবে জগতে বিকশিত হওয়া। যে পারবে নিজেকে অন্যের তুলনায় আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে তারই হবে জগৎ বিস্তার। সে টিকবে এই জীবন পথের প্রবাহে। আবার একই সঙ্গে সে পারবে সবাইকে অনায়াসে গড়ে দিতে, অথবা গড়ে উঠবার পথে সমর্থন দিয়ে এগিয়ে দিতে।

পাশ্চাত্যের দর্শনে জগতের দৃঢ় সত্যকে গভীর অনুধাবন করেই জেনেছিলেন সক্রেটিস। সক্রেটিস এটি বুঝেছিলেন অন্তরে কোন এক সৎ বস্তু রয়েছে লুকিয়ে- প্রকাশিত হয়ে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। সক্রেটিসের সময়ের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষ থেকে বহু মানুষ ব্যবসার কাজে আসতেন ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলে। বড় বড় কয়েকটি ব্যবসার টিম ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন বস্তু সাজিয়ে আসতেন ইউরোপ অঞ্চলে। ইটালীর ক্রোটন শহর ছিল এই ব্যবসার মিলন ক্ষেত্র। ক্রোটনে ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীরা মিলে তাদের নানা সামগ্রী বিক্রি করে ওই মূল্যবান নানা বস্তু জোগাড় করতে হতেন তৎপর। ব্যবসায়ীদের দলের সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে মধ্যপ্রাচ্য পেরিয়ে ইউরোপের এই ইটালীয় ক্রোটন অঞ্চলে যেতেন দু একজন করে জ্ঞানী-প্রজ্ঞাবান-ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিদের কেউ কেউ। ক্রোটন অঞ্চলে গড়ে উঠল ক্রোটন স্কুল, এখানেই বোধায়নের গনিত সূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বোধায়ন এই সূত্রে বিভিন্ন জ্যামিতিক কাঠামো প্রস্তুই করেন। পিথাগোরাসের জ্যামিতিক তত্বের চয়নের বহু পূর্বেই নানা রকমের কাঠামোর জ্যামিতির পরিমাপ সেখান বোধায়ন। যেমন বেদবিহিত যজ্ঞ করবার জন্য যজ্ঞক্ষেত্র নয় বাই নয়-বাই নয়- মোট সাতাশটি কোণের মাঝে বিস্তৃত হয় যজ্ঞ বেদীর ভূমি বিন্যাস। এই ভূমি বিন্যাসের পরিমিতির মধ্যে রয়েছে মাঝখানের গোলক, ত্রিভূজের সমাহার, সরলরেখা প্রভৃতি। এছাড়াও যজ্ঞ কাষ্ঠের জন্য যে ভূমি বিন্যাস ছিল সেটি ট্রাপিজিয়ম অথবা অন্যভাবে রেক্টাঙ্গেল বিস্তৃত হয়েছিল। ক্রোটন স্কুলে ভারতের প্রজ্ঞাবান ঋষি যে কয়েকজন গিয়েছেন তারা ওখানে জ্ঞান বিচার করেছেন, উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরম বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান পরিবেশন করেছেন উপযুক্ত ক্ষেত্রে। জানা গিয়েছে বাল্যাবস্থার বেশ কিছু বৎসর সক্রেটিস কাটিয়েছিলেন ইটালীর ক্রোটন অঞ্চলে। খুব সম্ভবত ইটালীর ক্রোটন স্কুলের প্রভাব ও তত্ব সংবেদ তাঁর কাছে এসে যায়।

সক্রেটিস বুঝলেন আত্মজ্ঞান প্রয়োজন। বললেন 'নথি সিয়াটন'-নিজেকে জান। 'নোদাইসেলফ্‌' আত্মজ্ঞান লাভের এই আহ্বানের পরম্পরায় এগিয়ে আসেন প্লেটো। প্লেটো তার গুরু সক্রেটিসের আহ্বানকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ভেবেছিলেন। তিনি লিখলেন 'রিপাবলিক' একটি আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলবার পরিকল্পনা ছিল রিপাবলিকের প্রত্যয়ের নিরীখে। যদিও বাস্তবে সুযোগ পেয়েও প্লেটো সেটি সম্পন্ন করতে পারেননি।

আত্মতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ নচিকেতাকে যম দিয়েছেন। কঠ-উপনিষদের তত্ত্ব প্রকাশে রয়েছে পরমাত্মা স্বয়ং আত্মারূপে সব জীবনে, প্রাণে প্রাণে, বিরাজ করছেন। এই শরীরকে একটি জীবন রথ হিসাবে বুঝতে হবে আর জানতে হবে এই জীবন রথেই আত্মা বিরাজ করছেন।

আত্মানো রথিনম বিদ্ধি, শরীরম রথম এব তু। বুদ্ধি তু সারথি বিদ্ধি, মনঃ প্রগ্রহম্ এব চ।

আত্মা বিরাজ করছেন এই শরীর নামক রথের উপর। এই জীবন রথটি সাধারণভাবে পরিচালিত হয়ে চলেছে জীবের মানবিক বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে। শরীর রথটির সঙ্গে আত্মার সংযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। শরীর রথটির সঞ্চালন হয়ে চলেছে আমাদের পার্থিব মন বুদ্ধির প্রভাবও নিয়ন্ত্রণে। এই প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সদাই যেন জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। মন পার্থিব পরিবেশের দ্বারা মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এমন পরিবেশ থেকে মনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হয় ভগবৎ পাদপদ্মে। এই জীবনেরই সাথী হয়ে রয়েছেন ভগবান সবসময়ে। তিনি স্বতঃই জীবন ব্যাপারে নির্লিপ্ত। অথচ যে প্রাণ ভগবানকে গভীর ভাবে চায় তিনি সেই প্রাণের সহযোগী হয়ে বিরাজ করেন। যে চায় সে পায় তাঁর সঙ্গ; তার কাছেই ব্রহ্মপরিচয় হয়ে ওঠে মূর্ত, খ্যাত।

শ্রীরামকৃষ্ণের জগতটি একাকার হয়ে যাওয়ার জগৎ। যা কিছু রয়েছে অন্তরে তাই হতে পারবে বাইরের বাস্তবতা। যে সম্পদ অন্তর মাঝে হয়ে থাকে স্বতঃ গ্রথিত তারই ভাব ও বার্তাবহ হয়ে জীবন তার চরিত্র স্বভাব কর্মচিন্তা ও কর্মের পথ ধরে। নিত্যই যে ভাবপ্রদীপ অন্তর মাঝে অবস্থান করে রয়েছে একান্তে, সুপ্ত অবস্থায়; এখন তার জাগরণের আহ্বান। কৃপামুখর তিনি ভালবাসার আহ্বানে হন জাগ্রত। স্বতঃই তার এই জাগরণের ক্ষণে তিনি হয়ে ওঠেন আপন জন। যেন একটি জাগতিক সম্পর্ক। ভগবান ভক্ত এই সম্পর্কের দূরত্ব ক্রমে কমে গিয়ে যে পরিচয় প্রমুখ গড়ে দেয় তার বহুমুখি প্রত্যয় রয়েছে। কখনও তিনি মাতা, কখনও পিতা, আবার কখনও তিনি সখা বন্ধু অথবা অন্য পরিচয়ে বৃত হয়ে স্বতঃই ধরা দেন। ভগবান হয়ে ওঠেন ভক্ত জীবনের নিত্য প্রেরণা, নিত্য সঙ্গী। তিনি ক্রমে জীবনের মাঝে তাঁরই অবস্থানের আসনটি করে দেন দৃঢ়। বিশ্বাসে, ভালবাসায়, ভক্তিতে যখনই তাঁকে আঁকড়ে ধরবে এই জীবন, তিনিও জীবনের মাঝে হৃদয় দ্বারে হয়ে উঠবেন যেন ভালবাসার বন্ধনে বন্দী। তিনি স্বতঃই সর্বত্র বিরাজ করেন – এটী যেমন সদাই সত্য; তেমনি তাঁর এই বিরাজমানতা দৃঢ় হয়ে ওঠে বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ভরপুর। এই জীবন মাঝে তাঁরই অবস্থান ও পরিচয় সদাই জীবনে হয়ে উঠবে বাঙ্ময়।

শ্রীরামকৃষ্ণ এনেছেন আধ্যাত্মের নবীন পরিচয় ভারতের অতি প্রাচীন বৈদিক সত্যলাভ অভীপ্সার পটভূমিতে। ঋক্‌বেদের আবাহনকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কালী ভজনার পথ দিয়ে। অহরহ তিনি মায়ের কথাতেই ডুবে থেকেছেন। জগজ্জননী কালী তাঁর ব্রহ্মপথের দ্বারোন্মচন করে দিয়েছেন তাই নয়, তিনি কালীর ভাব সমুদ্রে অবগাহন করেছেন সদাই ব্রহ্ম ভাবে ভরপুর হয়ে। কালী-ব্রহ্ম একাকার হয়ে গিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপথে। কালীই তাঁর সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন হয়ে রূপময় সদা বিরাজমান এই সৃষ্টির সর্বত্র, আর লালন করে চলেছেন এই সৃষ্টিকে নিত্য বিকাশের সূত্রে। ঋকের আবাহনে ঋক্‌বেদের ঋষিগণ এই সৃষ্টির সব প্রকাশবান অবস্থায় ভগবানকে আবাহন করেছেন। ঋষীগণের আবাহনে সচ্চিদানন্দ প্রকাশবান হয়েছেন তাঁদের যজ্ঞের অগ্নিরূপে। অগ্নির তাপনে যে শক্তি ও সামযজ্ঞ প্রস্তুত হয়েছে ঋষিগণের এই নিত্য প্রকাশের আহ্বানে তিনি অগ্নি-বায়ু-আকাশ-ব্যোম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাশে মূর্ত হয়েছেন।

**<u>শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বপ্রকাশঃ</u>** তত্ত্ববিচার প্রয়োজন জগতের দৃষ্টিকোণ ও জগতের বিষয় চর্চা এবং জীবন ধারার প্রয়োজনে। ভগবান লাভ যিনি জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহন করেছেন তাঁর জন্য কোনও তত্ত্ব বিচার প্রয়োজন হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবান লাভের যে পথ গুলি বলেছেন তার মধ্যে দুটি প্রধানঃ

যৎ করোষি যৎ অশ্নোষি যৎ জুহোষি তপস্যাহসি যৎ
তৎ কুরুস্ব মৎ অর্পনম্।।

এটি জীবনের পথে যিনি সক্রিয় হয়ে রয়েছেন অথবা যার চরিত্র বিচার এমন কর্মমূখর তারই জন্য। কর্মের পরিসর যেমন খুশি হতে পারে। যার দায়িত্ব ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করা। তার জন্য যুদ্ধে পারদর্শী হয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে জয়ী হওয়া আর পরিনামে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। কর্মের বিচার ও প্রকরণ যাইই হোক না কেন ঐ কর্মের বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য হতে হবে। কর্মটি নিজ স্বার্থ ব্যতিরেকে হবে। কর্মের যা কিছু ফলাফল হোক না কেন সেটি হবে পূর্ণ রূপে ভগবানে নিবেদিত। এমন কর্ম জগতের পরিপেক্ষিতে হোক অথবা ভগবানের পথে সাধন ভজন জনিত হোক যদি ফলাফল পুরোপুরি নিবেদিত হতে পারে, তবে সে কর্মই ভগবানের প্রিয় কর্ম। ভগবান স্বয়ং এমন কর্মীকে শুধুমাত্র বরণ করেন তাই নয়; তিনি এমন মানুষের সদা সঙ্গী হয়ে বিরাজ করেন যেমনটি করেছেন অর্জুনের ক্ষেত্রে।

অন্যপথটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন অর্জুনকে, যেটি নিবেদনের আহ্বান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানঃ

মন্মনা ভব মৎ ভক্ত মৎযাজি মাং নমষ্কুরু।
মামৌবৈশ্যতি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়ঃ হ মে।।

ভগবৎ ভাবনায় বিভোর হয়ে যাও; ভগবানের জন্য ভক্তি যোজনা কর আর ঐ ভক্তি সম্পদে ভরপুর হয়ে থাক। তিনি ভগবানের ভাবে সর্বদাই ভরপুর হয়ে থাকেন তার হৃদয়ে ভক্তি জমতে থাকে। তিনিই পরম সত্যের প্রকাশকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। এই ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন সত্যের উৎস স্থিতি বিস্তার ও পরিনতি। আদি মধ্য অন্ত ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ঐ অনন্ত সত্য জগৎময়। হয়ে থাকা নিত্য বিস্তারে। এমন যিনি অন্তরে ভগবৎ ভাব সর্বদা পোষণ করে রয়েছেন, হৃদয়ের মাঝে ভক্তির সঞ্চার করেছেন আর সদাই ব্রহ্ম সত্যের ক্রম উন্মোচনে নিজ চেতন মন ব্যপ্ত করেছেন; তিনিই এই জীবন প্রবাহে হয়ে রয়েছেন ভগবানের নিত্য আশ্রয়।

ভক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণের মৌল সাধন বিচার। পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তিনি সচ্চিদানন্দ হয়েছেন অরূপে সদাই ভগবান। তিনি কখন প্রজ্ঞাষ্পদ হয়েছেন ব্রহ্মপ্রজ্ঞায় নিজে সকল সৃষ্টির মাঝে হয়েছেন প্রজ্ঞা চেতনে ভাস্বর। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম তিনিই হয়েছেন প্রজ্ঞা। ভগবানের স্বরূপ পরিচয়ই ভগবৎ প্রজ্ঞা। তাঁকে এই প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে জানবার পর্বে এই উপলব্ধি সাধক প্রাপ্ত হবেন যে ব্রহ্ম প্রজ্ঞাই ব্রহ্মপ্রকাশ। তার এই প্রজ্ঞা রূপটি সৎ। অর্থাৎ ব্রহ্ম সনাতন প্রজ্ঞাভাস্বর হয়ে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে তাঁর চেতনকে মিশ্রিত করে দিয়েছেন। এখনই তিনি ভগবানকে বরণ করতে চান, তার জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয় ঈশ্বর লাভ, তবে তিনি ঈশ্বর লাভের জন্য হয়ে উঠবেন ব্যাকুল। যো সো করে ঈশ্বরলাভ এমনই হয়ে উঠবে তার মনের মাঝে অভিব্যক্তি। ইনি জানবেন ঈশ্বর লাভ জীবনের সুদূর কালের উদ্দেশ্য নয়, এটির প্রায়ওরিটি সবচেয়ে বেশি। ১৮৮৪ এর ২৫শে মে দক্ষিনেশ্বর মন্দিরে এসেছেন সুরেন্দ্র, গোপাল, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি। বিজয় কৃষ্ণের সঙ্গী কীর্তনিয়া গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস পালা ধরিয়াছেন। 'কীর্তনানন্দে ঠাকুর দন্ডায়মান সমাধিস্থ হইলেন। অল্পে অল্পে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। ঠাকুর সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। 'কৃষ্ণ' এই কথা এক একবার উচ্চারণ করিতেছেন। আবার এক একবার পারিতেছেন না। বলিতেছেন কৃষ্ণ!কৃষ্ণ!কৃষ্ণ!কৃষ্ণ! সচ্চিদানন্দ! কই তোমার রূপ আজকাল দেখিনা। এখন তোমায় অন্তরে বাহিরে দেখছি-জীব, জগৎ, চতুবিংশতি তত্ব, সবই তুমি। মন, বুদ্ধি সবই তুমি। তুমি অখন্ড তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রেখেছ। তুমিই আধার, তুমি আধেয়। প্রাণ কৃষ্ণ! মন কৃষ্ণ! বুদ্ধিকৃষ্ণ! আত্মাকৃষ্ণ! প্রাণ হে গোবিন্দ মন জীবন!' ভগবৎ প্রেমের ভাবসাগরে সদা নিমজ্জিত শ্রীরামকৃষ্ণ।

**ভক্তিময় প্রেমতনু শ্রীরামকৃষ্ণঃ** শ্রীরামকৃষ্ণকে দিনের পর দিন কাছ থেকে দেখেছেন শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত ১৯০২ সালের প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে মাষ্টার মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি ঠাকুরের নানা সময়ের নানা অবস্থার কথা লিখে প্রকাশ করবেন। উপক্রমনিকায় লিখলেনঃ

'ভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দিবসের মধ্যে নানা অবস্থায় দেখিতেন ঠাকুর ঈশ্বরাবেশে কখন একাকী, কখনও বা ভক্ত সঙ্গে নানাভাবে থাকিতেন। সেই সকল অবস্থা ও ভাবের কয়েকখানি মাত্র চিত্র শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতে , আপাতত সন্নিবেশিত হইল। সেই চিত্রগুলি সূচিপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্তরঙ্গ ও ভক্ত লইয়া ঠাকুরের আনন্দ ও বিদ্যাসাগর, কেশব, বঙ্কিম ইত্যাদি অনেক ভক্ত পন্ডিতের সহিত দেখা এসমস্ত কথা পর পর খন্ডে যথাসাধ্য বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি কলকাতা, ১লা ফাল্গুন,১৩০৮ (১৯০২)।'

কথামৃতের পাতায় পাতায় পাঁচটি খন্ডে মাষ্টার মহাশয়ের উপস্থাপনা প্রকৃত সত্য। শ্রীমা সারদা দেবী মাষ্টার মহাশয়ের এই উপস্থাপনাকে সবই সত্য বলে বলেছেন। মায়ের আশীর্বাদ বানী এবিষয়ে প্রত্যক্ষ সমর্থন।

'শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ

বাবাজীবন,

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যক মত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে না জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্থ তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্থ কথা বলিতেছেন।

জয়রামবাটী, ২১শে আষাঢ় ১৩০৪।'

যে প্রতিশ্রুতি মাষ্টার মহাশয় দিয়েছিলেন, সেটি তিনি রক্ষা করেছেন নিজের মত করে। পর পর পাঁচটি খন্ডে শ্রীম প্রকাশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও সেই সঙ্গে এমন তাঁর বিশেষ ভাবে পরিবেশন শৈলী ও প্রতিভা যে পায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ঠাকুরের লীলা প্রকাশ করেছেন কথায়, বর্ননায়, গানে, নিবেদনে যেন প্রতিটি অধ্যায় প্রতিটি অনুচ্ছেদে রয়েছে এক একটি নিখুঁত ছবি। ছবির মত বর্ননায় এটি ভরে রয়েছে। কথামৃত পাঠ ও অধ্যয়ন যিনি মনোযোগে করবেন, বুঝবেন প্রতিটি অধ্যায়

অনুচ্ছেদই এক একটি ধ্যানের পটভূমি। পড়া ও পাঠকরার পর ঐ প্রসঙ্গ-পটভূমি ও তত্ত্ববিচার নিয়ে ধ্যানে নিমগ্ন কোনও বিশুদ্ধ প্রাণ বুঝতে পারবেন তত্ত্বও সবটাই। অন্যথায় কথামৃত থেকে যাবে সাহিত্যের একটি সংযোজন হিসাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত একদিকে ইতিহাসের সম্পদ-সরাসরি ইতিহাস; এটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য যার সবচেয়ে বড় গুণ হল উপস্থাপনা। অতি সংক্ষেপে, এক দু কথায় একটা বিরাট ভাব ওর মধ্যেই রয়েছে। সবার উপর এক অধ্যাত্ম সম্পদ। এটি সত্যের আকর উৎস। শ্রীমা সারদাদেবী কথামৃতে ঠাকুরের সব কথাকে শুধু সত্য তাই বলেননি, বলেছেন, যেন ঠাকুর নিজে কথা বলছেন মাষ্টার মহাশয়ের মধ্য দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অধ্যাত্ম পথের অভিযাত্রীদের জন্য অমূল্য এক সম্পদ। নানা প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে; নানা ধরণের মানুষদের সঙ্গে ঠাকুর নানা ভাবে কথা বলছেন। কথা ও গান এবং নানাভাবে ঠাকুর সব সময়েই ভগবানের প্রসঙ্গ করেছেন।

বানী ও গানের মধ্য দিয়ে ঠাকুর ভগবৎ তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। কথামৃত যদি না থাকত শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্ব গল্পকথার বিষয় হয়ে উঠত। গ্রাম্য নানা কথা- উপকথার সরণি দিয়ে কত কিছু বিচিত্র ভাব ও কথা গড়ে যেত হয়তবা তার ইয়ত্তা করা কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও তত্ত্বমঞ্জরীর প্রধান উৎস শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত। এখানে মাষ্টার মহাশয় যে যে দিনের কথা ও ঘটনা নথীভুক্ত করেছেন সেগুলিই হয়ে রয়েছে প্রকৃত উৎস। জীবন-জগৎ ও ভগবান সবই একাকার হয়ে গিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণে। মাষ্টার মহাশয়ের প্রতিদিনের ঘটনায় যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের সবারই পরিচয় রয়েছে। ঘটনার দিনক্ষণ স্থান পরিচয় যেমন রয়েছে তেমনি সব পটভূমিতে রয়েছে। ঠাকুর প্রচুর গান করেছেন, এছাড়াও বহু গান নানাজনে তাঁকে শুনিয়েছেন-গানগুলি সবই ঠাকুরের পছন্দের।

শ্রীরামকৃষ্ণ গান করেছেন সবসমেই একটা তাৎপর্য মূলক পটভূমিতে। যে ভাব প্রবাহ ঠাকুরের মধ্যে গড়ে উঠেছে তার প্রকাশ হয়েছে কথায় আর গানে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি যে ভাব দ্যোতক তারই সমর্থনে তিনি করেছেন গান। শ্রীরামকৃষ্ণ গানের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজেরই ভাবদীপিকাকে প্রবলতর সহজ করে দিয়েছেন। গানগুলির সবই তাঁর তত্ত্ব ও ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। গানের একটির পর একটি পর্বে ঠাকুর ভাবপ্রবাহে হয়েছেন মগ্ন। সদাই তাঁর কথা আর গানের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে তাঁর বিপুল ভাবপ্রবাহ। গানের প্রবাহে নৃত্য করেছেন বহু সময়ে, হয়েছেন সমাধীতে লীন। গানের পটভূমিতে ওই গানের তত্ত্বসন্দেশের সকল প্রকাশ ঘটেছে প্রতি দিনের কথা ও ভাব প্রকাশে।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের গাওয়া অথবা পরিবেশিত গান

(কথামৃত অবলম্বনে)

| গানের শ্রেনী বিভাগ | প্রথম খন্ডে | দ্বিতীয় খন্ডে | তৃতীয় খন্ডে | চতুর্থ খন্ডে | পঞ্চম খন্ডে | মোট | শতাংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট | ৪১ | ৯০ | ৮৭ | ১৩০ | ৬৭ | ৪১৫ | ১০০% |
| মাতৃসঙ্গীত | ৩৩ | ৪৮ | ৫০ | ৬৭ | ৪১ | ২৩৯ | ৫৮% |
| বৈষ্ণবোচিত ভক্তি সঙ্গীত | ৬ | ৩২ | ৩২ | ৪৫ | ২১ | ১৩৬ | ৩৩% |
| বৈদান্তিক সঙ্গীত | ২ | ১০ | ৫ | ১৮ | ৫ | ৪০ | ৯% |

শ্রীরামকৃষ্ণের যে তত্ত্বপ্রকাশ তার মধ্যে শ্রেনীবিভাগ করলেই দেখা যাবে আটান্ন শতাংশ গুরুত্ব রয়েছে মাতৃসঙ্গীতে; ত্রেত্রিশ শতাংশ বিষ্ণু ভক্তিতে আর ন শতাংশ গুরুত্ব রয়েছে বেদান্তের নিরাকার নির্বিশেষ নিরঞ্জন ভগবানের রূপবিহীন প্রকাশের প্রতি। ভক্তিতত্ত্বের পূর্বভারতীয় প্রধান ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনোচিত ভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

| প্রথম উপায় | দ্বিতীয় উপায় | তৃতীয় উপায় | চতুর্থ উপায় | পঞ্চম উপায় | ষষ্ঠ উপায় | সপ্তম উপায় | অষ্টম উপায় | নবম উপায় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্বধর্ম আচরণ | কৃষ্ণে কর্ম অর্পন | স্বধর্ম ত্যাগ | জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি | জ্ঞান শুন্যা ভক্তি | প্রেমা ভক্তি | দাস্য প্রেম | সখ্য প্রেম | কান্তা প্রেম | মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্তি |
| শ্রবণ | কীর্তন | বিষ্ণু স্মরণ | পাদ সেবন | অর্চন | বন্দন | দাস্য প্রেম | সখ্য প্রেম | আত্ম নিবেদন | শ্রী শ্রী ভাগবতম্ অনুসারে |

ভক্তির নবম উপায়কে মহাপ্রভু শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছেন। রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যের নির্নয় বিষয়ে আলোচনায় শ্রীচৈতন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন্ন তাই নয় তিনি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন কান্তাপ্রেমকে। বলেছেন কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার এরও পরে এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন রাধার প্রেম সর্ব সাধ্য শিরোমণি।

**<u>ভক্তির মহাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণঃ</u>**

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে গৌরাঙ্গ-রামানন্দ মিলন পর্বে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের অন্তিমে লিখেছেনঃ

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব সাধ্যসার।।
প্রভু কহে এই সাধ্যবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।।
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি।।

গৌরাঙ্গের তত্ব বিচারে ভক্তির শ্রেষ্ঠ অবস্থা হল কান্তাপ্রেম-রাধার প্রেম। শ্রী শ্রী ভাগবতম্ ভক্তির শ্রেষ্ঠ অবস্থা আত্মনিবেদন। কান্তাপ্রেম বিষয়ে তাঁর মনোভাব আত্মনিবেদনেরই মত। বিশেষ করে রাধার প্রেমের মূল কথা আত্মনিবেদন। ভগবতের পথ থেকে শ্রী গৌরাঙ্গের ভক্তি পথের রয়েছে তফাৎ। ভাগবত এই আত্মনিবেদনকেই শ্রেষ্ঠ পথ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তি পথের শ্রেষ্ঠ উপায় বলেছেন মাতৃভক্তি। মাতৃভক্তিই ভক্তির শ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে বরণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এটিই ফুটে উঠেছে কথামৃতের পাতায় পাতায় মাতৃভিক্তির সিঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। মাতৃভক্তির প্রভাব পায় আটান্ন শতাংশ ক্ষেত্রে রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামা মায়ের ভক্তিতে ভরপুর হয়ে রয়েছেন। 'কালী-ব্রহ্ম জেনে মর্ম' শ্রীরামকৃষ্ণের মৌল সাধন তত্ব। জগৎ মাঝে কান্তাপ্রেম তত্ব পরিচয়টির প্রকৃত সাধন রূপ পেতে হলে প্রথমেই বৃন্দাবন ভক্তির ও বিশুদ্ধ মনের পটভূমি প্রয়োজন। মহাপ্রভুর সাধন তত্ব ভগবানের জন্য অকুন্ঠ ভালবাসা-প্রেমের উপরেই স্থিত। কান্তাপ্রেমের কথা মানবিক সম্পর্কের সঙ্গে ভাবগত সাযুজ্যের দিকে টানতে পারে। বিশুদ্ধ মনেরও মাঝে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। বিশ্বামিত্রের দীর্ঘ সাধন; দীর্ঘ সমাধির অবস্থার পরও মেনকা দেবীর উপস্থিতির আকর্ষন দিয়েছিল টলিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ এজন্যই মাতৃভক্তিকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এ পর্যন্ত বেদান্তের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত হয়েছেন জগতের কাছে। তাঁর প্রধান তত্বই হল ভক্তি। ভক্তির বিশেষত্ব গড়ে দিয়েছেন মাতৃভক্তির মধ্য দিয়ে। মঠ মিশন ভিত্তিক উপস্থাপনায় তাঁর সাধন পর্ব, জীবন পর্ব, কথা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে; কখনও এক বা একাধিক পর্বকে অনুচ্চারিত রেখেই খ্যাত হয়েছেন। ভক্তজনের মধ্যে স্বতঃই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদার প্রতি ভক্তি নিবেদিত হয়েছে। ভক্তের মনে হৃদয়ে শ্রীরাকৃষ্ণ সারদার স্থান অন্তরের অন্তঃস্থলে। অথচ প্রতিষ্ঠানিক উদ্দোগের নিরীখে জগৎময় তাঁর অবস্থান বৈদান্তিক। প্রতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিগণ নিজেদের পরিচয় দেন বৈদান্তিক মন্ত্র-বেদান্তবাদী সন্নাসী রূপে। সমস্যা এখানেই। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের বেড়াজালে হয়ে রয়েছেন আবদ্ধ। বেদান্তের ট্রান্সেন্ডেন্টাল, অম্নি প্রেজেন্ট, অমনিসিয়েনীই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তির সারতম প্রকাশ।

**<u>মুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণঃ</u>** শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ব পরিচয় অনুসারেই হতে হবে তাঁকে কেন্দ্র করে যে ভাব প্রতিষ্ঠান সবারই গড়ন। পরিনতিতেই সব ধারার মধ্যেই বেদান্তের নির্বিকল্প ভাবটি সাধারণভাবে থাকবেই। সাধনের পরিনতিতেই জগৎ সংসার এমনকি ব্যাক্তির নিজ জীবনটি পর্যন্ত দূরে সরে যায়। ভগবানই হয়ে ওঠেন জীবনের একমাত্র। তিনিই জীবন চেতনের সবটুকু জুড়ে তখন বিরাজ করেন ভক্ত জীবনের অন্তরে বাইরে। যেন বিরাজ করেন অদৃশ্য সঙ্গী হয়ে সব সময়ের সব অবস্থার জন্যই। ভক্তির পথটি এমন চর্যার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসে ভালবাসায় গড়ে ওঠে ভক্তির প্রাসাদ। ভক্তির প্রাসাদ ধারন করে থাকেন ভগবানই। ভক্তের মাঝে গড়ে ওঠা ভক্তি যতই নির্ভেজাল হয়ে উঠবে ভক্তির শক্তি সংহত হয়ে ভগবানকে ভালবাসায় সেবায় করে দেন ভরপুর। ভক্তের জীবন মাঝে যে কর্মচিন্তা আর কর্মের ভাব জীবন মাঝে ফুটে ওঠে এমন ভাবে যেন ঐ কর্মচিন্তা আর কর্মের পরিসর তার নিজের মধ্যে সীমিত থাকে না। ভগবৎ রঙে শুধুমাত্র মনটি রাঙিয়ে যায় তাই নয়; প্রাণের আকূতি হয়ে ওঠে শুধুমাত্র ভগবানের জন্য। যেন সর্বক্ষণের প্রায় সবটাই অধিকার করে রয়েছেন তিনি শয়নে-স্বপনে-জ্ঞানে –ধ্যানে সর্বাবস্থায় ভগবানই হয়ে ওঠেন জীবনের প্রধান আর আপনতম।

শ্রীরামকৃষ্ণ অহর্নিশি ভগবৎ প্রসঙ্গ করেছেন। কথায় গানে সর্বক্ষণেই ভগবৎ প্রসঙ্গ করেছেন। সব তত্ব বিচার হয়েছে কিন্তু তিনি সর্বদাই ভক্তির মহাসাগরে বিরাজ করেছেন। দক্ষিনেশ্বরে অথবা কলকাতার যে কোন স্থানেই তিনি গিয়েছেন- ওই ভক্তিসাগরের জলে সব অন্তর ভরিয়ে দিয়েছেন সব দ্বিধা দ্বন্দ অহঙ্কারের বেড়াজাল। বড়- ছোটো সবই ভেসে গিয়েছে।

**শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন তত্ব ভাবনা গানে গানে**

**মাতৃভক্তি**

- সদানন্দময়ি কালী মহাকালের মনোমোহিনী
- যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিনী শ্যামা মাকে
- নিবিড় আঁধারে মা চমকে ঐ রূপরাশি
- আয় মন বেড়াতে যাবি কালীকল্পতরুমূলে
- মা গো আনন্দময়ী আমায় নিরানন্দ করো না
- আমায় দে মা পাগল করে (ব্রহ্মময়ী)
- আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে
- অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তর যামিনী
- কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মাতাই
- মা ত্বং হি তারা তুমি ত্রিগুনধারা পরাৎপারা
- এসো মা এসো মা হৃদয়রমা
- আমি ঐ খেদে খেদ করি শ্যামা
- মজলো আমার মন ভ্রমরা
- কে জানে কালী কেমন ষড়দর্শনে না পায় দরশন
- আর ভুলালে ভুল্বোনা দেখেছি তোমার রাঙা চরন
- শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখানা উড়িয়েছিল
- এবার আমি ভাল ভেবেছি

**কৃষ্ণপ্রেম**

- চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী
- মহাভাব রাসলীলা কী মাধুরী মরিমরি
- মরির মরির সখি নিশ্চয় মরিব
- কানু হেন গুন নিধি করে দিয়ে যাব
- ধনি দাঁড়ানো বে অঙ্গ হেলাইয়ে ধনি দাঁড়ানো রে
- প্রেমধন বিলায় গোরা রায়
- যশোদা নাচাতো শ্যামা বলে নীলমনি
- গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়
- হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে
- হরিরস মদিরা পিয়ে মন মানস মাতরে
- গৌর নিতাই তোমরা দুভাই

**বেদান্ত**

- চিন্ময় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন
- জয় জয় পরব্রহ্ম অপার তুমি অগম্য
- পরাৎপর তুমি সারাৎসার
- পরবত পাথার ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যত বাজ
- যেভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে

ভগবৎ পথের অভিলাষীর জন্য সব মার্গই উন্মুক্ত। একেক্কি যুগের একেক ধরণের মহিমা ও প্রাধান্য থেকে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে হাজার বৎসরের সভ্যতার নতুন করে গড়তে আহ্বান এসেছে। আদি ঋক্‌বেদের সময় থেকে এ পর্যন্ত সাম্য মৈত্রী সামঞ্জস্যের বার্তা একমাত্র ঋক্‌বেদই দিয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনই পারে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী সামঞ্জস্যকে অনুধাবন ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে। এক মন একই প্রাণের আকূতি একই হৃদয় সংবেদ এসব না গড়ে উঠলে জীবন মাঝে ব্রহ্ম প্রকাশ ব্যাপ্ত হয় না। সমানি বঃ আকূতিঃ। সমানী হৃদয়ানি বঃ। মনের প্রাণের চাওয়া আর হৃদয়ের ভালবাসা যখন ভগবানের জন্য একমাত্র নিবেদিত হতে থাকে তখনই গড়ে ওঠে সাম্য মৈত্রী সামঞ্জস্যের পটভূমি। ভগবৎ বোধের ভিত্তি ব্যতিরেকে সমাজের মধ্যেকার মানুষে মানুষে সাম্য মৈত্রী বিষয়ে প্রকৃত বোধ জাগ্রত হন। ভাগবতী বোধ ও উপলব্ধি ব্যতীত সাম্যের বিষয়টি শুধুমাত্র হয়ে থাকে বাহ্য বিষয় ভিত্তিক, সাময়িক কোন পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। এটি সাম্য মৈত্রীর সম্পাদনা যেটি করতে চায় তার অর্থ হয়ে যায় সাময়িকের প্রভাব মুক্ত হয়ে গিয়ে বৃহৎ ভাবনার পরিসর থেকে ফিরে আসে ক্ষুদ্রত্বের পরিসরে। ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে যখন বৃহতের ভাবনার প্রভা সীমিত হয়ে যায় ওই ভাবনার রূপ প্রকাশও হয়ে যায় সীমিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীর কাছে উপহার দিয়ে গেলেন আগামীর জন্য শ্রেষ্ঠ বার্তা। "ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য'- এই বার্তা বিশ্বমাঝে জড় প্রবাহের মাঝে ভগবানকে বরণ করে নিয়েই চলুক জীবন যাত্রা। 'গড় সেন্ট্রিক লাইফ'- জীবনের কেন্দ্র ভগবান যা কিছু কর্ম ও কর্মচিন্তা হোক ভগবানকে নিবেদন করে। মনের মাঝে যা কিছু ছিল মানবিক তাকে সরিয়ে ভগবানকে সদাই মননে বরণ করে নিয়ে ভাগবতী ভাব প্রবাহ অন্তর রাজ্যকে করবে ভরপুর আর ক্রম বিকাশে ভগবানই ভালবাসার প্রদীপে হয়ে জীবন মাঝে হয়ে উঠবে জ্যোতির্ময় প্রকাশ।

**<u>কালী-ব্রহ্ম মহাসাগরে নিমগ্ন ভক্তিময় তনুঃ</u>**

ব্রহ্মই স্বয়ং সব হয়েছেন। এই মানুষ, জীবকূল, জড় উপাদান, আকাশ-বাতাস সবই। নক্ষত্র, গ্রহ সবই; উপরে নীচে যা কিছু রয়েছে ব্রহ্মই এইসব হয়েছেন। এইসব ব্রহ্ম থেকেই জাত, ব্রহ্মেই বিরাজিত। এদের লয়ও ব্রহ্মেই। হাহাকার তাহলে কেন? কোথায় রয়েছে আক্ষেপের সুযোগ? এক ব্রহ্ম কত কত রূপে করছেন বিরাজ! সব রূপেরই রয়েছে বিশেষত্ব। সব রূপেরই রয়েছে দুটো রূপ। সব রূপ তাঁর ঐ মহান রূপের সবটা নানাভাবে প্রকাশ করবার প্রয়াস করেছেন। তিনি চাঁদ হয়ে দিয়েছেন স্নিগ্ধ, কোমল আলোর ধারা। চাঁদের এই আলোক পৃথিবীর বুকের রাত্রির অন্ধকার ঘুচিয়ে দেয়। পৃথিবীর বুকে যে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে তার কারণেই আলোর উৎসগুলি ফুটে ওঠে। আলোর সব উৎস জ্যোতির্ময় হয়ে ভাস্বর হয়। চন্দ্র স্বয়ং ঐ আলো বিকিরণ করে চলেছেন। চাঁদের পৃষ্ঠে মানুষ নেমে কোথাও আলোর ঠিকানা পায়নি। যা কিছু আলো এসেছে সবই সূর্যের কাছ থেকে। যতটা আলো ঢেলে দিয়েছে সূর্য তার বেশ কিছুটা নিজের অঙ্গের পাথর মাটি, ধুলি কণার মধ্যে শুষে নিয়ে বাকিটা পাঠিয়েছে জগতের কাছে- ঐ আলোয় জগৎ আলোকিত হয় পূর্ণিমার দিনগুলিতে। চাঁদ একটা জড় পিন্ড, অথচ এই জড় পিন্ডই আলোক বস্তু হয়ে জগতে ধরা দিয়েছে। জড়ই চেতন হয়ে ধরা দিয়েছে উপযুক্ত দ্রষ্টার কাছে। যে ঠিক ঠিক দেখতে সক্ষম তাঁর কাছে ঐ জড় বস্তুই আলোক উজ্জ্বল হয়ে দান করছে স্নিগ্ধ আলোক। যেটি আপাত দর্শন তার পিছনেই লুকিয়ে রয়েছে একটি প্রকৃত দৃষ্টি। প্রকৃত দৃষ্টি যখন খুলে যায় ঐ বস্তু তার স্বরূপে দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে। জীবন এমনভাবেই চলেছে। এই জগৎ, এই সংসারে সর্বত্র আপাত দৃষ্টি আর আপাত পরিচয় দিয়েই আমরা কার্যাদি পরিচালন করে চলেছি। যে কার্যধারা সচরাচর আমাদের দৃষ্টিকে প্ররোচিত করে তারই পিছনে থাকে সম্ভাবনা। এক একটি পর্বে জীবনের এক একটি সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়। একটু একটু করে যেমন একটি শিশু বড় হয়, তেমনি একটু একটু করে আমরা সত্যের কাছে এগিয়ে যাই। জীবনের অভিজ্ঞতা সত্য উন্মোচন করে। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ক্রমে শিখি। আজ যে সত্যকে জানা হয়েছে, আগামীকাল সে সত্য অনেকটাই প্রাচীন হয়ে যাবে। যে ঘটনার প্রভাবে আজ বহু মানুষ বিচলিত, এমনকি ভীষণভাবে সমস্যার দ্বারা ভারাক্রান্ত, সময় আসবে যখন সেসব ঘটনা চাপা পড়ে যাবে কালের স্রোতে। পরিবারে একটি নতুন সদস্যের আগমনে যে আনন্দের ঢেউ খেলে যায় ঐ আনন্দ উবে যায় কিছুদিন যেতে না যেতে। জগতের গন্ডী পেরিয়ে পরিবারে একজন চলে গেলে যে দুঃখ, গ্লানি,

কিছুদিন পর সেটিও ম্লান হয়ে যায়। কালের গহ্বরে সব হারিয়ে যায়। সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না সবই কালের রথের নীচে পড়ে গিয়ে পিষ্ঠ হয়ে যায়। কাল সব খেয়ে নেয়। আজ যেটিই প্রধান, কাল সেটি গৌণ হয়া যায়। কাল চিহ্নিত করে দেয় সব কিছুর মধ্যে যে অনিবার্যতা রয়েছে তাকে। তাই জীবনের প্রয়োজনে জগতের সেসব বস্তু অনিবার্য করে নেওয়া হয়েছে, আগামীকাল সেগুলিই যেন কখন সাধারণ হয়ে যায়। রাজার মুকুট আজ যে পরেছে, কাল হয়ত তাকেই হাত পাততে হবে কারোর কাছে। জীবনের জ্ঞান, ধ্যান, ধন-রত্ন সবই ক্ষণিকের। সবই কালের অববাহিকতার স্রোতের সঙ্গী মাত্র। কখনও বা এগুলি প্রতারক। ভুলিয়ে দেয়, জীবনকে তার প্রকৃত জ্ঞান পথ থেকে ভুলিয়ে সরিয়ে নিয়ে আসে- প্রতারণাও করে। জীবনের যে ফুল শোভা বিস্তার করেছে, একদিন তা ঝরে যাবে। যে ফল জীবনকে সম্পদ মূখর করে তুলেছে, সেটি হয়ে উঠবে নিষ্প্রভ। আসে যে হাততালির কবলে পড়ে জীবন উল্লাসিত কাল যে হাততালির কোনও ভূমিকাই থাকবে না- অর্থহীন হয়ে যাবে। হাজার- লাখো মানুষের দেওয়া হাততালি মনকে মুখর করে তুলতে পারে। মনের মধ্যে এনে দিতে পারে গর্বের ধারা। মন প্রভাবিত হয়ে আনন্দে ভাসতে পারে। আবার হাজার-লাখো মানুষের দেওয়া অপবাদ মনকে অবসাদে সমষ্যায় ভরিয়ে দিতে পারে। মনের মধ্য জাগতে পারে প্রবল ধিক্কার, প্রবল দুঃখ। মানুষের দেওয়া পুরস্কার-তিরস্কার বিচলিত করে শুধু তাই নয়, এটি গতি নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। পুরস্কার-তিরস্কারের গন্ডি পেরিয়ে যখন চেতন শক্তি এগিয়ে যায়-খুঁজতে থাকে কোনও অনির্বচনীয়কে। ঐ অনির্বচনীয় মূর্ত হয়ে ধরা দেন। যেন হাতের কাছে। এই এখানে, এখনই হয়েছেন উন্মোচিত। জীবনের সব বন্ধনের আঁট এ সময়ে শ্লথ হয়ে আসে। বন্ধনগুলি একটির পর একটি ঘাট খুলে ক্রমে একেবারে উন্মোচিত হয়ে যায়। আপনার জন্য আপনি বন্ধু-এ অবস্থা কাটিয়ে জগতের বন্ধু হয়ে ওঠে প্রাণ-মন-হৃদয়, নিজেকে নিবেদন করে ক্রমে সে এগিয়ে যেতে পারে তখন। নিজেকে নিজের কাছে- জগতের কাছে নিবেদন করার কাজটি যেমন খুব সহজ নয়, তেমনি আরওবৃহত্তর ক্ষেত্রে ভগবানের কাছে নিবেদনও সহজ নয়। ভগবানের কাছে নিবেদনের বিশেষ কোনও কোনও পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া নেই। এটি শুধু নিজের মনের বাতায়ণকে খুলে দেওয়া আর মনকে বুঝিয়ে নিয়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। নিজের পরিচয়ের নিরিখে সব বুঝতে চায়- বোঝাতে চায়। মন সবই দেখে নিজের ওজনে, নিজের গুণে। মনের যে রঙ, সে রঙ রাঙিয়ে তোলে সবকিছু, মনের বিশিষ্টতায় অন্যকে দেখে বিশেষ। আবার মনের সাধারণ অবস্থায় সবকিছু সাধারণ হয়ে যায়। মানুষের মনে থাকে বড় মাপের অহং। অহং-এর দাপট মনকে বিগড়ে দেয়। অহং-এর দাপট সাধকের মন থেকেও যেতে চায় না সহজে। সাধকের সাধন পথে আসে সিদ্ধাইয়ের আকর্ষণ। সিদ্ধাই একটি থেকে অন্য স্তরে এগিয়ে গিয়ে সাধক নিজেই জগতের প্রভু, নিয়ন্ত্রা হয়ে বসেন। সাধন জীবনে এই নিয়ন্ত্রণ পর্বসাধকের মৌলিক যোজনা থেকে সরিয়ে দেয়। ভগবানের পথে এগিয়ে চলতে চলতে তার মধ্যে এটা-ওটা করে দেবার জন্য প্রবণতা জেগে ওঠে। সাধকের নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস প্রবল হতে থাকে। এর ফলে লক্ষ থেকে সরে আসতে হয় সাধককে। ভ্রান্তি এসে গ্রাস করে। সবার ক্ষেত্রে একটি সাবধানী বাণী। সাধকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের বলা একটি উদাহরণ এরকম (কথামৃত)ঃ

"একটি সাধুর খুব সিদ্ধাই হয়েছিল আর সেই জন্য অহঙ্কার হয়েছিল। কিন্তু সাধুটি লোক ভালো ছিল। ভগবান ছদ্মবেশে এক সাধুর বেশ ধরে তার কাছে এলেন। এসে বললেন মহারাজ! শুনেছি আপনার খুব সিদ্ধাই হয়েছে। সাধু খাতির করে তাকে বসালেন। এমন সময়ে একটা হাতি সেখান দিয়ে যাচ্ছে। তখন নতুন সাধুটি তাকে বললেন, 'আচ্ছা মহারাজ, আপনি মনে করলে এই হাতিটিকে মেরে ফেলতে পারেন?' সাধু বললেন, "যাস্যা হোনে সক্তা'। এই বলে ধুলো পড়ে ঐ হাতিটির গায়ে দিতেই সে ছট্‌পট্ করে মরে গেল। তখন যে সাধুটি এসেছে সে বললে, 'আপনার কি শক্তি! হাতিটাকে মেরে ফেললেন।' সে হাসতে লাগল। তখন সাধু বেশধারী ভগবান বললেন, 'আচ্ছা, হাতিটাকে আবার বাঁচাতে পারেন?' সে বললে, 'ওভি হোনে সক্তা হ্যায়।' এই বলে আবার ধুলো পড়ে দিল, এমনি হাতিটা ধড়মড় করে উঠে পড়লো। তখন সাধুটি বললে, 'আপনার কি শক্তি!'

কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই যে হাতি মারলেন, আর হাতি বাঁচালেন আপনার কি হলো? নিজের কি উন্নতি হলো? এতে কি আপনি ভগবানকে পেলেন? এই কথা বলার পরই সাধুটি অন্তর্ধান হলেন।

সাধুর চৈতন্য জাগ্রত হওয়াটা সেসময়ে স্বাভাবিক। ভালভাবে বিচার করে সাধু যদি দেখেন তাহলে বুঝবেন সিদ্ধাইয়ের কাজে জগতের কোনও লাভ নেই। আবার সাধুরও সাধন পথে কোনও লাভ নেই। ভগবানের পথে এর দ্বারা একবিন্দুও এগিয়ে যাওয়া হবে না। বরং ভগবানের পথে এগিয়ে যাওয়ার যে মনের আকর্ষণ সেটি ক্ষীণ, ম্লান হয়ে যাবে। সরাসরি ভগবানের কথা ভাবা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন (কথামৃত)ঃ

"সকলেরই জ্ঞান হতে পারে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। প্রার্থনা কর- সেই পরমাত্মার সঙ্গে জীবনের যোগ হতে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর; করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে-ঘরেতে আলো জ্বলবে। শিয়ালদহে অপিস আছে।.....

"কারুর চৈতন্য হয়েছে। তার কিন্তু লক্ষণ আছে। ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু শুনতে ভাল লাগে না। যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গা যমুনা, নদী সব তাতে জল রয়েছে কিন্তু চাতক পাখি বৃষ্টির জল চাচ্ছে! তৃষ্ণাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু অন্য জল খাবে না।....."

ভগবানে রুচি হলে সবই হোল। একটু একটু করে সব যদি মজে যায় তবে কালে তার ফল মেলে। রুচি ক্রমে ভক্তি আবাহন করে নিয়ে আসে। ভক্তির বীজ বাড়তে পারে সব অবস্থাতেই। অনুকুল পরিবেশে ভক্তির বীজ বাড়ে। ভক্তির বীজ প্রতিকূল অবস্থাতেও বাড়ে। সব অবস্থাতেই ভক্তির বীজ বাড়তে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়ঃ

"তাঁর নাম বীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল; তবু শক্ত মাটি ভেদ করে মাটি ফেটে যায়।"

"সংসার কর্মভূমি এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশের বাড়ী, কলকাতায় গিয়ে কর্মকরে।

"কিন্তু কর্ম করা দরকার। সাধন। তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়। স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর পাখা, চোঙ মুখ দিয়ে হাওয়া করে যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। সোনা গলাবার পর তখন বলে তামাক সাজ্। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছিল। তারপর তামাক খাবে।

"খুব রোক চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।....."

কাজ করবার সময়ে পূর্ণ মনোযোগ দিয়েও করেও মনের গভীরে ভগবানকে ধরে রাখা যায়। ভগবানকে মনের গোপন কোণে ধরে নিয়ে যদি কর্মের সাগরে ঝাঁপ দেওয়া যায় তবে বাকিটা তিনিই দায় নেন। ভক্তির কণা একটু একটু করে ভক্তির দানা বেঁধে দেয়। একটু একটু করে ভক্তি দানা বাধে। আবার ভক্তি যেন লতা। বাড়তে থাকে নিজেই। বীজ বপন হয়েছে লতা তার রস সংগ্রহের সুযোগ যদি পায় তবে বাড়তে থাকে। দাশরথির পদ ঠাকুর প্রায়ই গাইতেনঃ

"জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান তূণ, বাসনা-ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।।
আর এক যুক্তি রণে, চাই না রথরথী, শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি,
রণভূমি যদি করে দাশরথী ভাগীরথীর তীরে।।"

জগতের এই পটভূমিতে কাল প্রবেশ করেছে ঘরে। জীবনের যাত্রা শুরু কালের পটভূমিতেই। মহাকালীর কৃপার ছাতায় না আসলে কালের গ্রাসে পড়বে জীবন। কালের এই গ্রাস থেকে মুক্তির পথ ভগবানকে ডাকা তাঁর শরণ নেওয়া। শরণাগতকে

তিনি রক্ষা করেন। ভগবানের চরণে শরণ নিয়ে জীবন চলুক এগিয়ে। জীবনটা একটা যুদ্ধ। জগতে সবসময়েই চলছে যুদ্ধ। যুদ্ধ কত রকমের! অন্তর আর বাহিরের যুদ্ধ এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন। বাইরের পরিবেশে যুদ্ধ চলছে সবসময়ে। যে কোন কাজ শেষ করা, কাজটি স্বার্থক করে তোলা প্রকৃত যুদ্ধ। যে কাজটি আরব্ধ তার পরিণতি যত সময় পর্যন্ত যথাযথ না হয়ে উঠছে প্রতিটি পর্বে পর্বে সেজন্য রয়েছে যুদ্ধ। কাজ করবার পথে সব অনুকুল হয়ে উঠলে অন্য একটি যুদ্ধ এসে যায়। এই যুদ্ধে দুজন কর্তা। অহং কর্তা হয়ে রাজা হতে চায়। কাজের সব কৃতিত্ব সে দাবী করে। কাজের সবটাই তার নিজের দিকে নিয়ে যেতে চায়। যে কাজটি প্রারব্ধ তার সম্পূর্ণতা এখন প্রশ্নাধীন হয়ে ওঠে। কাজ আর কাজের রাজার সংজ্ঞা সঠিক ভাবে নিরুপণ করা হয়ে ওঠে না। কাজ আর কাজের রাজার সংজ্ঞা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর ফলে কাজ আর কাজের রাজার সম্পর্ক রচনা করতে হয়। জীবনের এই কর্ম সংগ্রামের সাথে আসে সাধন সংগ্রাম। সাধন সংগ্রামের জন্য তৎপর হতে হয়। সাধন কত ধরনের। সব ভাবেই রয়েছে সংগ্রাম। সংগ্রামে টিকে থাকা আর জয়লাভ করা এজন্য ভক্তির বাহন দরকার। সাধন সঙ্গীত তাই এটিকে বর্ণনা করেছে রথ রূপে। ভক্তিরথ। ভক্তি রথে চড়ে যেতে হবে এগিয়ে। ভক্তি রথে চড়ে শুধু এগিয়ে গেলে ভক্তির মধ্যে ভেজাল, মিশ্রণ, আবিলতা আসতে পারে। তাই বলছেন হাতে নাও জ্ঞান তূণ। জ্ঞানের বান কর প্রয়োগ। জ্ঞানবাণটি প্রয়োগ কর ভক্তির রথে থেকেই ভক্তির রথে চড়ে সাধন এগিয়ে চলবে জ্ঞান প্রয়োগে।

**<u>মাতৃভক্তির ভারসের প্রবাহেঃ</u>** ভক্তির রথে চড়ে তূণ এটি প্রকৃত সাধন পথ। কেউ কেউ ধারণা করেন জ্ঞান বিপথগামী। বিপথগামী হয়ে থাকে পান্ডিত্য। যা কিছু মস্তিস্ক ও মনপ্রসূত তার মধ্য রয়েছে একপেশে বোধ। সবকিছু একটি ক্ষীণ দৃষ্টির আড়ালে দেখার প্রবণতাকে জ্ঞান বলা হয় না। জ্ঞান হল ভাগবতী। ভগবানের বোধ, উপলব্ধির মিলন হল জ্ঞান। ব্রহ্ম উপলব্ধির ধারা যখন চলতে থাকে এমন হয়- জানা এই জগতের সীমা অতিক্রম করে যায় অনুভব আর বোধ। তখন একটা ক্ষুদ্র বাতাবরণ ও পরিধির মধ্যে বিরাজ না করে মানুষের চেতন বড় পরিধিতে হয় ব্যাপ্ত। এই পরিধির মধ্য শুধু সে নিজে বিরাজ করে না-আরও অনেকে-অন্যেরা বিরাজ করে। এই আনন্দ বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা- এরা সবই যেন এখানে একটি পরিচিত বাতাবরণের মধ্যে থাকে। এই পরিচিত বাতাবরণ উপলব্ধি দিয়ে গড়া, অনুভব দিয়ে গড়া। উপলব্ধি ও অনুভবের মেলবন্ধনে একটু একটু করে নতুন জগৎ তৈরীই হয় জীবনের অভ্যন্তরে। বাইরের জগৎ আর অভ্যন্তরের জগতের মধ্যেকার বিরোধ নিরসন হয়ে যেন একটিই জগৎ হয়ে যায়। কিছু সৃষ্টির এই পর্বে এসেছে, যা কিছু বিগত দিনগুলিতে ছিল- কালের ঘরে চলে গিয়েছে, আর যা কিছু আসবে আগামীতে- সবই ধরা দেয় সাধকের এই সাধন চেতনে। সাধন ক্রমে উন্মোচিত হয়ে বড় হয়ে যায় আর ভূমার পরশ পায়। ব্রহ্মের এই প্রকাশ জগৎ নতুন করে ধরা দেয় এমন মনের পটভূমিতে। ঈশ্বর অনুরাগী মন-হৃদয়-প্রাণ ক্রমপ্রকাশে ঈশ্বরকে বরণ করতে চায়। যেন আকাঙ্খী, যেন লালসায়িত, আকাঙ্খা ভগবানের জন্য। লালসা ভগবানের জন্য। এই আকাঙ্খা আর লালসাকে সযত্নে লালন করে বাড়িয়ে তোলা এ সময়ে সাধনার প্রধান লক্ষ হয়ে ওঠে। সাধনার পর্বটি ক্রমে নিজেকে হারিয়ে ফেলে ভগবানের কাছে করে সমর্পণ।

ভক্তির কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্য সাধারণ উপমায় বলেছেন। একজন ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে। রামদত্তের বাড়ীতে ঠাকুর এসেছেন। এখানে ভক্তেরা এসেছেন অনেকে। একজন ভক্ত প্রশ্ন করেন-"কোনটি ভাল, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি না প্রেমভক্তি?"

শ্রীরামকৃষ্ণ-ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হলে প্রেমাভক্তি হয় না। আর 'আমার' জ্ঞান। তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বললে, 'ভাই! আমরা সব মারা গেলুম!' আর একজন বললে, 'কেন? মারা যাব কেন? এস ঈশ্বরকে ডাকি।' আর একজন বললে, 'না, তাকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি।"

"যে লোকটি বললে আমরা মারা গেলুম, সে জানে না যে ঈশ্বর রক্ষা কর্তা আছেন। যে বললে, 'এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি'। সে জ্ঞানী; তার বোধ আছে ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব করেছেন। আর যে বললে, 'তাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস

গাছে উঠি, তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে, ভালবাসা জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই যে আপনাকে বড় মনে করে আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে যাকে ভালবাসে তার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত না ফোটে।"

ভক্তি জাগে ভগবানের নামের স্পন্দনে, রূপের আহ্বানে। ভক্তি সম্পদ আহরণ করতে হয় তাঁরই কাছ থেকে। তিনি মুক্তি দিতে নারাজ নন। ভক্তি একবার যদি জাগে তবে ভক্ত ভগবানকে বেঁধে ফেলেন ভক্তির আবর্তে। ভক্তি দড়ির অদেখা বাঁধুনি তাকে এক মূর্ত সম্পর্কে নিয়ে যায়-ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক। এমন হয়ে যায় যে সম্পর্ক যে কোনওভাবে যেন তফাৎ করা যায় না-এক হয়ে যায়। রাধাভাব সমন্বিত কৃষ্ণতনু যেমন এসেছিলেন জগতে রাধা প্রেমের বাঁধন খুলে দিতে বহুজনের জন্য। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে যে তনু বিগলিত হয়েছেন প্রেমভাবে জগত সংসারে। সবাইকে কৃষ্ণরসে মজিয়ে, মাতিয়ে তিনি জগতে কৃষ্ণ প্লাবন করেছেন আহ্বান। কৃষ্ণভাবরসে ভেসে যাওয়া গৌরতনু এমনই এক আহ্বান জগতে ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন যা অনন্য- সব বেড়া ডিঙিয়ে, যুগের সীমা পেরিয়ে চলেছে ভাসিয়ে সব অনুরাগীকে। ভাবপ্রবাহে ভেসে গিয়ে ক্রমে নিজেকে আবিস্কার করতে পারে ভক্তপ্রাণ। যে ভাব বৃন্দাবনে গোপীদের মাতিয়েছিল। বাঁশির সুর যে আহ্বান ধ্বনিত করেছিল সে ভাবের বন্যা ধরাতলে আবার এসেছিল বারবার নবদ্বীপে, দক্ষিনেশ্বরে। প্রেমের ঠাকুর ওই প্রেমবার্তা ধ্বনিত করেছেন সবসময়ে কালী ব্রহ্ম কৃষ্ণ কীর্তনে। মায়ের এই জগৎ সৃষ্টির সৃষ্টি মূলে ছিল যে বার্তা ঐ বার্তাকেই রূপ দেওয়ার বীজটি ঢেলে দিয়েছেন ধরিত্রীর গহ্বরে- নতুন চেতনের জাগরণে। 'তোমরা চৈতন্য হও'- যে চেতন ব্রাহ্মী, যা ব্রহ্ম বস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সেই চেতনের জাগরণ হোক মানুষের মধ্যে। নিজের পরিচয় যখন প্রকৃতভাবে উন্মোচিত হবে, নিজে যখন নিজেকে চিনবে তখন তার মধ্যে যে লুপ্ত সিংহ সে জেগে উঠবে। জগৎ জয় করবে এই চেতন। যা কিছু মিথ্যার মিশ্রণ আর মিথ্যার আবরণ তাকে ছিঁড়ে ফেলে ফুটে উঠবে জীবনের প্রকৃত পরিচয়।ব্রহ্মের অংশ ব্রহ্মই। আর অংশ হয়েও সেটি পূর্ণ। আগুনের ফুলকি আগুনই। যা কিছু রয়েছে গুণপণা আগুনের মধ্যে ঐ আগুনের ফুলকির মধ্যেও রয়েছে সেটি। দাহ্য বস্তুর স্পর্শ পেলে সেও অগ্নিকান্ড ঘটিয়ে দেবে। জীবনের সব বাহ্য পরিচয়ের বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে মাত্যান্তিক পরিচয় খুঁজে নেবে জীবন। গল্প দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়েছেন। গল্পটি পৌরাণিক। ঠাকুর একটু অন্য ভাবে পরিবেশন করেছেন এই গল্পটি। ফলহারিণী কালীপূজার দিনে দক্ষিনেশ্বরে ভক্তদের কাছে বলেছেন গল্পটি এরকমঃ

"এক গর্ভবতী বাঘ লাফ দিতে গিয়ে পড়ে মারা গিয়েছিল। কিন্তু মরে যাবার আগে সে একটী ছানা প্রসব করেছিল। বাঘটা মরে গেলে, ছানাটি ছাগলের পালে ছাগলদের সঙ্গে বড় হতে লাগল। তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও 'ভ্যা ভ্যা' করে বাঘের বাচ্চাও 'ভ্যা ভ্যা' করে। ক্রমে ছানাটি খুব বড় হল। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল। সে ঘাস খেকো বাঘকে দেখে অবাক্ তখন দৌড়ে এসে তাকে ধরলে, সেটাও ভ্যা ভ্যা করতে লাগল। কি শিকারী বাঘটি তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল। বললে দেখ, জলের ভিতর তোর মুখ দেখ – ঠিক আমার মত দেখ। আর এই নে খেনিকটা মাংস – এইটে খা। এই বলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগল। সে কোনমতে খাবে না – ভ্যা ভ্যা করছিল – রক্তের আস্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে। নতুন বাঘটা বলল এখন বুঝিছিস্ আমিও যা, তুইও তা; এখন আয় আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।"

ছাগলের দলে মিশে ছাগলের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিল বাঘের বাচ্চাটি। তার আসল পরিচয়টি ফুটে উঠতে ঐ-ছাগ পরিচয় মুছে গেল। মানুষের জীবন চলছে একটা স্বতন্ত্র পরিচয়ে। এই স্বতন্ত্র পরিচয়টি বেঁধে রেখেছে। তাই ভগবানের পথে এগিয়ে চলতে গিয়ে স্বাতন্ত্র্য ক্রমশঃই ফুটে উঠেছে। যে বাণী আর যে পথ ঐ ভাগবতী পথের হয়েছে অনুগামী। অনুগামীগণ ক্রমে এই পথকেই শেষ এবং শ্রেষ্ঠ বলেই মেনে নিয়েছেন। তাই সত্যের পথটি রয়েছে অনাবিস্কৃত। সত্য পথের পরশ এসে সত্য জ্ঞান পথে ডেকে নিয়ে যায় তাকে। জীবনের সব সত্যকে তখন নবীন করে যেন আবিস্কার করার একটি ক্ষণ। মানুষ তার

ব্রহ্ম পরিচয়কে বরণ করুক। হীনমন্যতার আর কোনও অবকাশ সেখানে থাকে না। ব্রহ্মপুরুষের সন্ধান পেয়ে ঐ ব্রহ্মপুরুষকে বরণ আর অনুসরণ। নিজের মধ্যেকার ভগবতী পরিচয় ফুটে উঠলে ভক্তিটি পাকা হয়। ঠাকুর দিয়েছেন একটি উপমা – কুমোরের মাটির হাঁড়ির উপমা। কত মাটির হাঁড়ি। সার সার সাজানো। সবগুলো একভাবে পাকেনি। কিছু রয়েছে যেগুলি পাকা, আর কিছু কাঁচা রয়ে গিয়েছে। সাজিয়ে রেখেছে রাস্তার দুপাশে। হাতি ঢুক্তেই ঝুর ঝুর করে ভেঙে গুড়িয়ে গেল। যে গুলি পাকা – সেগুলিকে আর ফেরানো যায় না – জন্ম শেষ, মুক্তি, যেগুলি এখনও কাঁচা সেগুলিকে আবার কুড়িয়ে তা দিয়ে নতুন করে মাটির হাঁড়ি কলসী হয়ে যাবে। কাঁচা থাকলে আবার ঘুরে আসবে। যদি ভক্তি আর জ্ঞান পাকা হয়। ভগবান যেমন কৃপা বিতরণ করবেন তেমনই হবে– এটি যথার্থ। তবে এর মধ্যেই রয়েছে সাধনের আর সেবার প্রভাব। সাধন দ্বারা ক্রমে নিজেকে জানা যায়। জ্ঞানের ডালি একটু একটু করে উন্মোচন হতে থাকে। সাধনার পথে আর ভক্তি পথে এগিয়ে গিয়ে সাধক ভক্ত ক্রমে জীবনের সব ধাপ পেরিয়ে চলবে ব্রহ্মপথে। বিরজা নদী। ঈলা বৃক্ষ – সেখানে সবই অমৃতময়। অমৃতের আহ্বান যে শুনেছে সে অমৃতের পথের যাত্রী হয়ে জ্ঞান আর সেবার দ্বারা জগতে ব্রহ্মের আবাহক।

সব কাজে চাই প্রয়াস। ভগবানের জন্য সাধনাও তাই প্রয়াস। সাধনার অঙ্গরাগ, অঙ্গ বিন্যাস, স্থান, ক্ষণ বিন্যাস, আসন বিন্যাস – এসবই যেমন রয়েছে তেমনি এসব কিছু ছাড়া শুধুই মনের অনুরাগ দিয়েও সম্ভব। যে পথে এগিয়ে গিয়ে ক্রমে তার সম্পর্কে অনুমান সামর্থ আসে, অনুভব সামর্থ আসে আবার একটু একটু করে অথবা একেবারেই তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান উন্মোচন হয় সেটিই যথার্থ পথ। জগতের সব কাজের মধ্যেই রয়েছে প্রয়াস নির্ভরতা। প্রয়াস ছাড়া কোনও কাজ হয় না। হঠাৎ করে হয়ত বা কখনও কখনও কোনও কিছু পাওয়া হতে পারে তবে সেটি সীমিত। প্রয়াসের দ্বারা যেটি অর্জন করা হয় সেটি সার্থক। প্রয়াস একেবারে আসে না। প্রয়াস আসে নানা পর্বে। প্রয়াস নানাভাবে। সাধুর কাছে ভগবানের সাধন করা – সব অসাধু কাজের স্পর্শ প্রভাব থেকে দূরে থাকা। সাধু হয়েছেন অথচ এখানে ঘাটতি রয়েছে এমন যদি হয় তবে প্রয়াস ঠিক ঠিক হল না। সাধুর পথে সাধুকে চলতে হবে। সাধুর মত যদি কেউ সাধুমনোচিত পথে এগিয়ে যায় সেও সাধু। ভগবানকে ভালবেসে যে ভক্তি নিবেদনে পারঙ্গম সে ভক্ত। তার বেশ যেমনই হোক ভগবানের জন্য ভালবাসা ও ভক্তি হৃদয়ে জেগেছে বলে সে ভক্ত। তার কাজ যা কিছু হোক না কেন। সমাজের সবচেয়ে নিচু তলা থেকে অথবা সবচেয়ে উঁচু তলা থেকে সে এসেছে কিনা – বিষয়টি সেখানে বিচার্য নয়। বিষয়টি এমনভাবে বিচার্য সে কি চায়? সে কাকে চায়? সে কি জগতের সব বিষয় জঞ্জাল চায়, ভালমন্দ ভোগের উপাদান আরও বেশি করে আরও দৃঢ়ভাবে চায়, সেকি বাসনা, কামনার দায়ে বদ্ধ হয়ে থাকতে চায় – নাকি অন্যকিছু? সে কি ভগবানকে চায়? সে কি ভাগবতী সঙ্গ চায়? সেকি ভাগবতী ভাবে বিভোর হতে চায়। সেকি ভগবানের আরব্ধ কাজে ব্রতী হতে চায়? সঙ্গী হতে চায় জগতে ব্রহ্মলীলার অথবা একই ব্রহ্মভাবে ডুবতে চায় – ডুবে থাকতে চায়। সে কাকে চায়? জগতের সব আকর্ষণীয়কে চায় অথবা জগতের সীমা অতিক্রম করা জাগদাতিরিক্ত সে শাশ্বত আকর্ষণীয়কে চায় অথবা জগতের সীমা অতিক্রম করা জগৎ অতিরিক্ত সে শাশ্বত সনাতনকে জীবনে বরণ করতে চায়। জীবের চাওয়ার নিরিখে ঠিক হয় তার পাওয়ার গতি। যা কিছু চাওয়া রয়েছে তার মধ্যে পাওয়াকে মিলিয়ে দেবার যে অখন্ড আনন্দ-আহ্বান তার অনুভব জীব করতে তৎপর হবে তো। যদি ঐ দিকে এগিয়ে আনন্দ-আহ্বান তার অনুভব জীব করতে তৎপর হবে তো। যদি ঐ দিকে এগিয়ে যাবার নেশা গড়ে না ওঠে, যদি ঐ ভাবে উন্নীত না হতে থাকে তবে জীবন হয়ে যায় শুধুই জগৎ কেন্দ্রিক, আংশিক। যে দায় রয়েছে জীবনের সেই দায় নিয়ে এখন এগিয়ে যাবার ক্ষণ আসবে জীবনকে নতুন আলোয় বরণ করবার ক্ষণ আসবে তখন। যে নতুন আলো জীবনের কাছে এসে আলোর পথ মেলে ধরবে সেই আলোই ওই অনাগত ভবিষ্যতের পথ দেখাবার আলো – জীবনকে নতুন করে চিনিয়ে দেবার আলো। এমন আলো যার প্রভাব যেমন বাইরের জগৎ তেমনি অন্তরের জগতকে করবে আলোকিত। বাইরের জগৎ আলোকিত হয়ে অন্তরের যে জগৎ তাকে করবে আলোকিত।

জীবনকে বরণ করে নেবে নতুন আদলে। আলো যদি সর্বত্রগামী হয় তবে সেই আলো শাশ্বতের প্রকাশ। অন্তর বাইরে আলোকিত করে এই আলো এখন বাইরে হাঁক দিচ্ছে। যেমন তিনি লিখেছিলেন নরেন প্রসঙ্গে। নরেন্দ্র ঘরে বাইরে হাঁক দিয়েছে। ডাক দিয়েছে জগতের মানুষকে। শৃন্বন্ত বিশ্বে। সবার কাছে তার আহ্বান রয়েছে 'এসো'। এসো নতুন জগৎ গড়ি। নতুন পৃথিবী গড়ি। এসো সবে ভগবানকে নিয়ে ঘর করি। তাঁকে কেন্দ্র করেই জীবন চলুক এগিয়ে। চারিদিকে ব্যাপ্ত ঐ মুক্ত শাশ্বত আলো নিয়ে আসুক জীবনের কাছে সব বার্তা। নবীন বার্তা। জাগরণের বার্তা। 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত।' এখন চেতন রাজ্যে ফিরে আসবার সময়। এখন ভগবানকে স্মরণ করবার সময়। এখন ভগবানকে বরণ করবার সময়। হৃদয়-মন-প্রাণ দিয়ে তাঁকে বরণ করবার এই ক্ষণে এখন শুধুই একদিকে ঈশ্বর ভাবনা ভরপুর হবার সময় এসেছে। নরেন্দ্র বলেছিনের 'শাক্চুন্নি একথা লিখে দিও।' তিনি যেদিন থেকে এসেছেন, সত্যযুগের সূচনা হয়েছে। যা কিছু অন্য যুগের প্রভাব কালের গহ্বরে সব মিলিয়ে যাবে। সত্যযুগে সত্য সাধনা। সত্যময়, চিন্ময়ের সাধনা। সচ্চিদানন্দের সাধনা। সচ্চিদানন্দের প্রকাশের সাধনা। যুগের এই সন্ধিক্ষন।

**<u>কালী-কালী-কালীঃ-</u>** যে চাইবে তাঁকে তারই হবে প্রাপ্তি। কম বেশি। আগে পরে। সবাই এই অন্নপূর্ণার দুয়ারে। পাত পাবে। কেউ সকালে, কেউ সন্ধায়। এখন ঈশ্বরের যুগ। চাইলে পাওয়া যায়। ঠিক ঠিক চাইলে ঠিক ঠিক পাওয়া যায়। ভেক ধরলেও কিছুটা। চাইতে হবে যথাযথ। আর অন্য কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নয়। নির্ভেজাল ভগবান। কে পারবে? এগিয়ে এস। কোনও এনট্রি ফি নেই। এখানে কোনও এনট্রি কোয়ালিফিকেশন নেই। একটিই প্রয়োজন রয়েছে তা হল বিশুদ্ধ মন। বাসনার আবরণ তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা মন। যে মন অন্য কোনও খানে শিকল বাধা নেই। এমন মন। যদি এমন মনের ঠিকানা না পাওয়া যায় তবে এর কোনও একটি সংস্করণেও হবে। এমনকি যদি অভিনয় করেও মনকে ভগবানের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয় অথবা ভান করেও যদি কেউ লোক দেখানো ভক্তি ও ধ্যানে নিযুক্ত হয় তবে তার মধ্যে জেগে উঠবে জীবনের নতুন অধ্যায়। ভাগবতী অধ্যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এক এক অনন্য উদাহরণ দিয়েছেন এ প্রসঙ্গে।

"এক জেলে রাত্রে এক বাগানে জাল ফেলে মাছ চুরি করছিল। গৃহস্থ জানতে পেরে তাকে লোকজন দিয়ে ঘিরে ফেললে। মশাল-টশাল নিয়ে চোরকে খুঁজতে এলো। এদিকে জেলেটা খানিকটা ছাই মেখে একটা গাছ তলায় সাধু হয়ে বসে আছে। ওরা অনেক খুঁজে দেখে, জেলে-টেলে কেউ নেই, কেবল গাছতলায় একটি সাধু ভস্মমাখা ধ্যানস্থ। পরদিন পাড়ায় খবর হল, একজন ভারী সাধু ওদের বাগানে এসেছে। এই যত লোক ফলফুল সন্দেশ মিষ্টান্ন দিয়ে সাধুকে প্রণাম করতে এলো। অনেক টাকা-পয়সাও সাধুর সামনে পড়তে লাগলো। জেলেটা ভাবল কি আশ্চর্য! আমি সত্যিকার সাধু নই তবু আমার উপর লোকের এত ভক্তি। তবে সত্যকার সাধু হলে নিশ্চয়ই ভগবানকে পাব সন্দেহ নাই।"

ভান করেই এতটা। যদি সত্যিকারের ধ্যান হোত, ভগবানে যদি সত্যিকারের মতি হোত তবে কত সহজে ভগবানকে দর্শন, স্পর্শ, সঙ্গ পেত। ভগবৎ আরাধনার পথে যেতে রুচি না হলে, একটু আধটু ভান করে ওপথে যদি কেউ গিয়েছে তবে একটু একটু করে তার মধ্যে আকর্ষণ জমতে থাকে। এই আকর্ষণ হতে পারে। একটু একটু করে প্রভাব আসতে শুরু হয়। প্রথম প্রথম অনুভব করতে বা বোধগম হতে কষ্টকর হয়। ক্রমে এই কষ্ট কমতে থাকে। অনুভবের রাস্থাটা একটু একটু করে খুলে যায়। অনুভব এসে জীবনের প্রাবল্য বুঝিয়ে দেয়। ভগবানের দিকে মতি একবার হলে বাড়তে থাকে। যেন চুম্বকের আকর্ষণ। দূর থেকে যখন আকর্ষণ করে-ক্ষীণ থাকে। ক্রমে যখন কাছে টানতে টানতে নিইয়ে আসে তখন বাড়তে থাকে ওই আকর্ষণের শক্তি। বাড়তে বাড়তে সেই চরম ক্ষণে চলে আসে যখন চরম ও চুড়ান্ত আকর্ষণের সময় আসে। ঐ চরম ও চুড়ান্ত আকর্ষণে চলে আসে সেটি চুম্বকের কাছে। ভগবানের কাছে চলে আসে যখন চুড়ান্ত আকর্ষণ রচনা হয়।

গয়লানির গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধরণ। গয়লানি দুধ যোগায় সবাইকে। সেদিন খুব অন্ধকার। জোর বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে। নদী পার হয়ে যেতে হবে। ওপারে পন্ডিতদের বাড়ী। তাদের ওখানে সে দুধের যোগান দেয়। এই দুর্যোগে ঘাটে

একটাও নৌকা নেই। বুড়ির এখন খুব সঙ্কট। নদী পেরোতে হবে। অসহায় গোয়ালিনি। ভাবল, 'রাম নামে শুনেছি ভবসাগর পার হয়। এটা তো একটা নদী মাত্র। রাম নামের ভর করে যাই রামই রক্ষা করুন।' 'এই নদী পার নিশ্চয়ই হতে পারব রাম নামে।' বিশ্বাসে ভর করে বুড়ি এগিয়ে গেল। রাম-নাম করতে করতে এগিয়ে চলল। নদী পেরিয়ে গেল। রামনামে ভাবতন্ময় হয়ে পার হয়ে গেল নদী। বুড়ি দুধ নিয়ে পন্ডিতের বাড়ীতে উপস্থিত। পন্ডিত জানত এই দুর্যোগে নদী অশান্ত। কোনও যোগাযোগ নেই। তাও এ কি করে পেরিয়ে এল। বুড়িকে প্রশ্ন করে পন্ডিত জানল ঘটনা। অবাক হয়ে গেল। বুড়ি বলল, 'কেন বাবা-ঠাকুর; রাম রাম করতে পার হয়ে এলুম।' রাম ভবসাগর পারের কান্ডারী। তাই রাম নামে নির্ভর করেই গয়লানি নদী পার হয়ে এসেছ। সম্পূর্ণ বিশ্বাসে। কোনও অবিশ্বাস আসেনি। পন্ডিতের মনে পড়ল তার নিজের কাজ রয়েছে ওপারে। জিজ্ঞাসা করলে আমিও রাম নাম করতে করতে পার হয়ে যেতে পারব? 'কেন পারবে না, নিশ্চয়ই পারবে।' এবারে দুজনে চলল। গয়লানির দেখানো পথে যদি ওপারে চলে যাওয়া যায় – সেই আশায় পন্ডিত এগুলো। বুড়ি যেমনটি এসেছিল রাম নাম করতে করতে দিব্যি নদীটি পেরিয়ে ওপারে চলে গেল। পন্ডিত জলে নেমে রাম-রাম করতে লাগল। আবার পরক্ষণেই তার নজর জামাকাপড়ের দিকে। জামা-কাপড় গুটায় আবার রাম নাম করে। বুড়ি ফিরে দেখল পণ্ডিতের দুরবস্থা। বোললে, 'বাবা ঠাকুর, রাম নামও করবে আবার কাপড়ও সামলাবে তা হলে হবে না।' পরণতি এমনই হোল। পণ্ডিতের পার হওয়া হোল না। রাম নাম সে শুনেছে, বিশ্বাসও হয়েছে, কিন্তু ভাঙা ভাঙা। কিন্তু বিশ্বাস ভগবানে আবার অন্যদিকে জগতের টান। একটু রাম আর বিষয়ের আকর্ষণ এমনই।

বিশ্বাস হলেই তো সব হল। গয়লানির নিবিড় বিশ্বাস। শুনেছে তার এই বিপদের উদ্ধার করবার উদ্ধারকারী স্বয়ং তিনি। তাই ওর পক্ষে বিশ্বাসের ডানায় ভর করে স্মরণ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। সরল বিশ্বাসে গয়লানি যে কাজটি করল সেটি পণ্ডিতের কাছে অসম্ভব, বিশ্বাসের ওরকম নিবিড় আকর্ষণ যখন জীবনে আসে সে জীবনের ভার স্বয়ং তিনিই নিয়ে নেন।

"বহির্মুখ অবস্থায় স্থূল দেখে। অন্নময় কোষে মন থাকে। তারপর সূক্ষ্ম শরীর। লিঙ্গ শরীর। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে মন থাকে। তারপর কারণ শরীর; যখন মন কারণ শরীরে আসে মনে আনন্দ-আনন্দময় কোষে মন থাকে।

তারপর মন লীন হয়ে যায়। মনের নাশ হয়। মহাকরণে নাশ হয়। মনের নাশ হলে আর খবর নাই।'

এমনই অবস্থায় জীবন যাপন। এতো নবীন ব্যবস্থা নতুন সভ্যতা। চাওয়া পাওয়ার বৃত্তে নয়। মনে একাগ্রতার মধ্য দিয়েই সাধন ঘন হয়।' এমন মানুষেরা তৈরি হবে। এখন চাওয়ার-পাওয়ার ভিত্তি। তখনই সব ভগবানের উপর ন্যস্ত হয়ে গেল।

'ঐরে আবার এসেছে।' মাষ্টার মহাশয়, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রবেশ করলেন ঠাকুরের ঘরে। মাস্টারের নেশা হয়েছে। ঘরে থাকা তার দায়। তাই ছুটে এসেছেন আবার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। মাস্টার মহাশয় শিক্ষিত, পন্ডিত, হেডমাস্টার। সমাজের উচ্চেলোকে তাঁর বিচরণ। ইংরেজি স্বভাব। হাতদুটি জোড়া করে নমস্কারটি পারেন। সাষ্টাঙ্গে নয়। আজই প্রথম। মাস্টার ভূমিষ্ট হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। ঘরভর্তি অল্প বয়সীরা। নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভবনাথ ও আরও কয়েক জন উনিশ-কুড়ির। ঠাকুর ওদের সবার সঙ্গে নানারূপ হাসি-ঠাট্টা করছিলেন। মাস্টার একটু অন্যরকম এখানে। হাসির জোয়ারে তার আর ভাসা হল না। হাসির জোয়ারে অন্যরা ভেসেছে। ঠাকুরও। মাস্টার ভাবছেন সেদিনের কথা। যেদিন হয়েছিল প্রথমদর্শন। রবিবার, ১৮৮২-এর ফেব্রুয়ারির শেষ। ঠাকুর হরিকথা বলে চলেছেন অনর্গল। পূর্বাস্য। তক্তপোশের উপর তিনি বসে। ভক্তেরা মেঝেতে। ঠাকুর বলছেন,

"যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে-কর্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হল।"

প্রথম দর্শনের যে আকাঙ্খা জন্মেছিল তা যেন পূরণ হচ্ছে। মাস্টার ইচ্ছা করলেন-সবটা ঘুরে দেখতে। ইনি এখানে কোন পরিমন্ডলে আর পরিবেশে সেটি দেখতে সাধ। সন্ধ্যার এই ক্ষণে গোটা মন্দির চত্তর মেতে উঠেছে। ঘন্টা ধ্বনি, আরতির মধুর শব্দ, বিভিন্ন যন্ত্রের ধ্বনি নিবেদিত হচ্ছে ভগবানের উদ্দেশ্যে। সব মিলিয়ে স্বর্গীয় বাতাবরণ। পাশেই বয়ে চলেছে অক্লান্ত গতিতে শ্রীভাগীরথী। সঙ্গীর সাথে মাস্টার মহাশয় রাসমণির দেবালয় ঘুরে ঘুরে দেখে প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে এবার ফিরে এলেন আবার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

এবার দেখছেন দ্বার বন্ধ। বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বৃন্দে ঝি। বৃন্দেই এবার পথ বলে দিলেন। মাস্টার মহাশয় আর বৃন্দের মধ্যে কথোপকথনঃ

মাস্টারঃ 'হাঁগা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন?'

বৃন্দেঃ 'হ্যাঁ, এই ঘরের ভিতরে আছেন।'

'তা ইনি এখানে কতদিন আছেন?'

'তা অনেকদিন আছেন-'

'আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?'

'আর বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে।'

'আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন? আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি? তুমি একবার খবর দিবে?'

'তোমরা যাওনা বাবা। গিয়ে ঘরে বসো।'

ওঁরা গিয়েছিলেন ঘরে। কিছু কথার পর চলে আসা – 'আবার এসো' শুনে।

আজ এসেছেন আবার ঐ পরিচিত ঘরে। আজ ঠাকুর বললেন, পরম ভক্ত হনুমানজীর কথা।

"দেখ হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চায় না; কেবল ভগবানকে চায়! যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে, ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়; কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়; সে বলল-

আমার কি ফলের অভাব।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষ ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।।
শ্রীরাম কল্পতরুমূলে বসে রই-
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।
ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই;
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।।"

হনুমানজীর একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবৎ ভক্তি ও ভালবাসায় রয়েছে যে অনন্য ভাব ঠাকুর সেটিকেই প্রকাশ করলেন। ঠাকুর এই ভক্তির ও ভাবের কথায় ভরিয়ে দিয়েছেন মাস্টার মহাশয়ের মন প্রাণ হৃদয়ে।

**<u>ভক্তিময় আত্মনিবেদনঃ-</u>** এসেছেন মহিমাচরণ। বেদান্তে বিশ্বাস। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেনঃ "বেদান্ত বিচারে, সংসার মায়াময়,-স্বপ্নের মত, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ-জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থারই সাক্ষি স্বরূপ।"

মহিমাচরনের মনের ভাব বুঝে ওই ভাবের অনুকুল একটি গল্প ঠাকুর বললেন। চাষীর গল্প।

"এক দেশে একটি চাষা থাকে। ভারী জ্ঞানী। চাষ-বাস করে-পরিবার আছে, একটি ছেলে অনেকদিন পরে হয়েছে; নাম হারু। ছেলেটির উপর বাপ-মা দুজনেরই ভালবাসা;কেন না, সবে ধন নীলমণী। চাষাটি ধার্মিক, গাঁয়ের সব লোকেই ভালবাসে। একদিন মাঠে কাজ করছে এমন সময় একজন এসে খবর দিলে, হারুর কলেরা হয়েছে, চাষাটি বাড়ই গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ীর সকলে শোকে কাতর হলো কিন্তু চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই। উলটে, সকলকে বুঝায় যে, শোক করে কী হবে? তারপর আবার চাষ করতে গেল। বাড়ি ফিরে এসে দেখে পরিবার আরও কাঁদছে। পরিবার বললে, তুমি নিষ্ঠুর ছেলেটার জন্য একবার কাঁদলেও না? চাষা তখন স্থির হয়ে বললে, কেন কাঁদছি না বলবো? আমি কাল একটা ভারী স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম যে রাজা হয়েছি আর আট ছেলের বাপ হয়েছি খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। এখন মহা ভাবনায় পড়েছি-আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক করবো, না, তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক করবো?

"চাষা জ্ঞানী, তাই দেখেছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন সত্য, জাগরণ অবস্থাও তেমনি সত্য', এক নিত্য বস্তু সেই আত্মা।"

মহিমাচরণের ছিল বিশ্বাসের দৃঢ়তা। ঈশ্বর বিশ্বাস দৃঢ় হতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কেও জন্মেছিল এই দৃঢ়তা। তিনি চেয়েছিলেন আরও বিশেষভাবে, গভীর ভাবে বুঝতে। ঐ নিরাকার, নির্বিকার, অসীম অনন্ত যদি আজ এসেছেন এখানে, তবে দেখে নি তাঁকে গভীর প্রত্যয়ে, নিবিড় ভালবাসার আকর্ষণে। আকর্ষণ জন্মেছিল মহিমের মনে। তাঁর ভক্তির দৃঢ়তা ক্রমে টেনে এনেছিল বার বার ঐ রূপবান অরূপের কাছে। এই জগৎ, এই জীবন, এই কর্মের স্রোত, জ্ঞানের প্রবাহ সবই মহিমাচরনের ছিল জিজ্ঞাসার ঝুলিতে। জিজ্ঞাসাকে আরও গভীরে নিয়ে গিয়ে চেয়েছেন জানতে ঐ পরব্রহ্মের স্বরূপ। তাঁকে জানব কেমন করে? তাঁকে জানাবই বা কেন? কী হবে তাঁকে জেনে। একি সময়ের সুব্যবিহার না অপচয়। জগতে কত কিছু করবার আছে! নিজের উন্নতির জন্য, নিজের সুখের জন্য কাজ। নিজের জন যার তাদের সুখের জন্য, তাদের উন্নতির জন্য কাজ। আরও এগিয়ে রয়েছে সমাজের কাজ।দেশের ও বিশ্বের মানব সমাজের অগ্রগতির জন্য কাজ। তবে কোন কাজটি ভাল, জানতে হবে। জানতে হবে এই সব কাজের মধ্যে কোন কাজের পিছনে ছুটে গিয়ে জগতের একটি পরিবর্তন করা যেতে পারে। আর ঐ পরিবর্তনের অংশীদার হওয়া যেতে পারে। যদি চাই জ্ঞান অর্জন করতে, তবে কত কিছু পড়তে হবে? শাস্ত্রাদি পড়তে যদি হয় তবে কটতা? কোন শাস্ত্র গ্রন্থটি তাঁর বেশি প্রিয় আর কোন্‌টি একটু কম? মহিমাচরন জানবার জন্য আজ অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছেন।

ঠাকুর বলেছেনঃ

"কর্ম চাই, তবে দর্শন হয়। একদিন ভাবে হালদার পুকুর দেখ্‌লুম। দেখি পানা ঠেলে জল নিচ্ছে। আর হাত তুলে এক একবার দেখ্‌ছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেল্‌লে জল দেখা যায় না- কর্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান, জপ, এইসব কর্ম, তাঁর নাম গুঙ্কীর্তনও কর্ম-আবার দান, যজ্ঞ, এ সবও কর্ম।

"মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাত্‌তে হয়। তারপর নির্জনে রাখতে হয়। তারপর দই বস্‌লে পরশ্রম করে মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা হয়।"

কর্মের কথায় সব গতিশীল প্রাণে আসে চাঞ্চল্য। জগৎ ছুটছে। হয়েছে গতিমান। মানব সীমার মধ্যে, জগৎ সীমার মধ্যে রয়েছে সব গতির মাধুর্য। গতিমান হয়েছে জীবন জগতের সব ক্ষেত্রে চায় জড়িয়ে পড়তে। জগতের এই বিপুল সব সম্ভাবনাকে মন্থন করে গতি আহরণ করা আর গতিময় হয়ে জগতের বুকে বিচরণ করাই মানব আকাঙ্খা। যারা এগিয়ে চলতে চায় তাদের গতিরূপে রয়েছে তীব্রতা। মনের মধ্যের সব জড়তা ও সব আবিলতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে তৎপর গতির সব উপাদান। মনের গতি সারল্যকে অতিক্রম করে ক্রমে জটিল আবর্তে চলে যেতে চায়। মনের আবর্তে রয়েছে কালের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে সেই উপাদান। আবার কালের সীমায় দুরের আবর্ত। মন তাই পরিকল্পনায় ভবিষ্যতের সব প্রেরণা, আকাঙ্খাকে সংহত করতে তৎপর হয়। সদা চঞ্চল মনও কখনও কর্মাদির গন্ডীর মধ্যে পড়ে আবদ্ধ হয়ে যায়। আবদ্ধ হয়ে মনের নিজস্ব রুচি প্রকৃতির বাধনে। আবার কোন কোন সময়ে এটী আবদ্ধ হয় বাইরের নানা আরোপন মনের উপর যেসব ক্রিয়াদি সম্পাদন করে তার উপর। মন কর্মের বন্ধনে বন্দী হয়ে স্বতঃই কর্মের গন্ডীকে ছিন্ন করে সম্মুখে এগিয়ে যেতে আগ্রহী হতে পারে যদি কোনও তাগিদ মনকে তারনা করে চলে। মনের সীমান্ত অন্তরের বা বাইরের, উভয়েরই হতে পারে। অন্তরে, বাইরে, ধ্যানে, কর্মে যে উপলব্ধির সঞ্চয় মন পেয়ে যায় ঐ উপলব্ধির বাঁধন মনকে নতুন প্রবৃত্তির অভিমুখে নিয়ে যেতে পারে। জীবন যুদ্ধে, জীবন যাত্রায়, মনের যে অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির সঞ্চয় তারই সব পরশ মাধুর্য মন বহন করতে চায়। জীবন ধন্য হয়ে ওঠে মনের এই স্ফূর্তি ও পরিণতিতে। মন এই স্ফূর্তি ও পরিণতিকে বরণ করে এগিয়ে যেতে চায় সম্মুখে। সম্মুখে রয়েছে প্রতিষ্ঠা, ধন, মান, বিজয় প্রভৃতি। এগুলির রসে মজতে চেয়ে ঐ দিকেই ধেয়ে চলে মন আর মনের গহন গতি। মহিমাচরণ বুঝতে চাইছেন একটি আধুনিক বিজ্ঞান। প্রীতির মনোভাবের পটভূমি থেকে ঈশ্বর জ্ঞান লাভের উপায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেনঃ

"বই পড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায় ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পৌঁছালে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে, শুনতে পাবে। 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' স্পষ্ট শুনতে পাবে।

"বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁকে দর্শনের পর বই শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড় কুটো বোধ হয়।

"বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাড়ি, কটা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, এটা আগে জানবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না- কোম্পানীর কাগজের খবর কি দেবে! কিন্তু যো সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙিয়েই হোক্ – তখন কত বাড়ি, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, তিনিই বলে দেবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর, দ্বারবান্ সব সেলাম করবে।"

কর্ম বন্ধন সৃষ্টি করে। আবার কর্মই এনে দিতে পারে বন্ধন মুক্তি। জগৎ কর্ম বন্ধনকে দৃঢ় করতে চায়। জগৎ কর্মের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কর্মের গুণাবলী এবং কর্মের সম্পদ থেকে কর্মের ফলাফলকে সূচিত করে। জীবের জীবন যাপন আর জীবনের বৈশিষ্ট্য বরণের জন্য এসব কর্মরাজির মধ্য থেকে ফলাফল সূচিত করে চলতে হবে এগিয়ে জগৎ পানে। কর্ম যদি অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে তবে আর মুক্তির পথ খুঁজে পাবে অনেক উদ্দ্যোগের বিসর্জন দানে। বহির্মুখী কর্মের যে তৎপর্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে সেটী উল্লেখযোগ্য। কর্মের উদ্দেশ্য যদি নিজ স্বার্থ চরিতার্থ মাত্র হয়ে থাকে তবে কর্মের পরিণতি বন্ধন হয়েই বিরাজ করে। পক্ষান্তরে কর্ম বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়ঃ চ। হয়ে থাকে তবে বন্ধন অতিক্রম করে মুক্তির সম্পর্ক আসতে থাকে। কর্ম নিজের বা জগতের যে কারনেই হোক না কেন এতে রয়েছে বন্ধন। নিছক নিজেরা নিজ জনের জন্য কর্ম কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করে। বহু জনের জন্য কর্মের বন্ধন কিঞ্চিত শিথিল। কর্মের সঙ্গে কর্মফল জড়িত থেকে। সুকর্মের সুফল; কুকর্মের কুফল। সুকর্ম ও কুকর্ম উভয়ই নানাভাবে, নানাসময়ে তাদের ফল দান করে। কর্মচক্রে এভাবে জীবের জীবনচক্র হয়ে ওঠে।

অথচ, কর্ম যদি তাঁকে সমর্পণ করা যায় তবে সেকথা স্বতন্ত্র। যে কাজ ভগবানে নিবেদিত সেটি বন্ধন মুক্ত। ভগবানের জন্য নিবেদিত কাজটি কেমন হবে? শুধুমাত্র কথার কথায় নয়। যে কাজ তাঁরই জন্য তার মধ্যে কোথায় রয়েছে জীবের মালিকানা? জীব ঐ কাজের কর্মী মাত্র। কর্তা তিনি স্বয়ংই। তাই এ কাজ ঐ কর্ম-কর্মফল চক্রের যে বন্ধন তার থেকে মুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ

"তাই কর্ম চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। যো সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর, 'দেখা দাও বলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো।

"শুধু তিনি আছেন বলে বসে থাকলে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাক্‌লে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চারা ফেলো। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়ত মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল, মাছটা ধপাঙ্ করে উঠলো। তখন দেখা গেল আরো আনন্দ।

"দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তবে তো মাখন পাবে।

"এ তো ভাল বালাই হলো! ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন। মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো। ভাল বালাই- মাছ ধরে হাতে দাও। "একজন রাজাকে দেখতে চায়। রাজা আছেন সাত দেউড়ীর পরে। প্রথম দেউড়ী পার না হতে হতে বলে রাজা কই? যেমন আছে, এক একটা দেউড়ী তো পার হতে হবে।"

**<u>মাতৃভক্তির সোপানে ব্রহ্মলাভঃ-</u>** চাই উদ্যোগ আর চাওয়া। ভগবানকে চাইতে শিখতে হবে। তাঁকে কেমন করে চাইব- সেটি বুঝে নিতে হবে। চাওয়াটি যতই খাঁটি হবে ততই পাওয়া হয়ে উঠবে সঠিক। চাওয়ার তীব্রতা পাওয়ার সামিপ্য বুঝিয়ে দেবে। চাওয়ার মধ্যে পাঁচমেশালি থাকলে হতে হবে হতাশ। আলু, পটল, ধন, দৌলত, বাড়ী ঘর, মন, যশ, এসবের আকাঙ্খা বজায় রেখে চাইলে তাঁকে চাওয়াটি হয়ে উঠবে পোষাকি। চাওয়া নিরেট, খাঁটি হবে না। চাওয়াকে নিরেট, খাঁটি করে তুলতে হবে। তবেই হোল যাত্রার শুরু।চাওয়া যত সঠিক হয়ে উঠবে এভাবে ততই আসবে প্রেরণা- কেমন করে ঐসব চাওয়াকে বাস্তবায়িত করা যায়। মনের মধ্যে, প্রাণের ও হৃদয়ের মধ্যে অনুরাগ আর আকর্ষণের তীব্রতা ক্রমে ক্রমে যায়। তাই চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার সাযুজ্য তৈরি হতে থেকে ভগবানকে চাওয়া যদি এরকম নিরেট - খাঁটি হয়। তাঁকে যদি চাওয়ার বাসনা তীব্র হয়ে তবে প্রেরণা আর সামর্থ্য আসে তাঁরই কাছ থেকে। তার নিজস্ব যে জগৎ ঐ জগতে ক্রমে ভগবান একান্ত, নিবিড় হয়ে উঠবেন। এমন চাওয়ার ক্ষণটি বিশেষ। ভগবানকে একমাত্র করে তাঁকে চাওয়া। এর ফলে পদনির্দেশ আর পথের পাথেয় তিনি সংস্থান করে দেন। এই অবস্থায় যে কর্মের উদ্যোগ আসে সেটির মধ্যে রয়েছে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য। চাওয়া এবং চাওয়ার যে কর্মের উদ্দোগ আসে সেটির মধ্যে রয়েছে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য। চাওয়া এবং ওই চাওয়ার রূপদান বা চাওয়াকে ফলবতী করে তুলতে যে কর্মোদ্যোগ সেটি এখন সঞ্চারিত হয়। হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রেরণা আর সামর্থ্য এ পর্যন্ত ফুটে ওঠেনি, ছিল গোপন, সেগুলি এখন ক্রমে রূপপ্রাপ্ত হয়। জগতের কর্মাদির প্রতি আসক্তি বা ঐসব কর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া বন্ধ হয়। চাওয়া এবং পাওয়ার উদ্দ্যোগ ক্রমে একই পথযোজনায় আসে। চাওয়ার ক্ষেত্র আর কর্মের ক্ষেত্রের মধ্যে এখন সাযুয্যের সম্পর্ক প্রস্তুত হয়ে যায়। এই কর্মের মধ্যে মায়ার টান, পিছু টান থাকে না। কর্মের সম্পাদন কার্যে আসে মনোযোগ। ওই কর্মের উপর কর্তৃত্ব অরোপ করবার কোনও সুযোগ আর থাকে না। কর্ম এখন হয়ে ওঠে সাধন ও ব্রহ্মপথের একটি উপযুক্ত সোপান। এই কর্ম প্রয়াসটি ভগবানকে বরণ করবার পক্ষে হয়ে ওঠে উপযুক্ত। যে কর্মের প্রতি ব্যক্তিগত কোনও আশা না থাকে, যে কর্ম বহু জনের জন্য বহুভাবে সংস্থাপিত হতে পারে সেটি মুক্তির বা মোক্ষকর্ম। জগৎ কর্ম ও মোক্ষ কর্মের মধ্যে যে তফাৎ সেটি উদ্যোগীর নিকট এখন হয়ে ওঠে পরিস্কার। উদ্দ্যোগ আর উদ্দ্যোগকারীর হাতে পুরোটা থাকে না। চলে যায় তাঁর হাতে। ক্রমে

ক্রমে সবটা। প্রথমে কিছুটা উদ্যোগ সাধক-ভক্তের, কিছুটা ভগবানের। এরপর যখন ঠিক ঠিক তাঁর প্রতি ভালবাসা আর ভক্তিটি সংহত হয়ে আসলো। তখন উদ্যোগ ভগবানের হয়ে যায়। তিনিই তখন উদ্যোগ নেন। ভক্তের হাত থেকে তার জগৎ কর্ম ও ব্রহ্ম কর্মের দায় ভগবান স্বয়ং নিয়ে নেন।

এসেছেন শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। সঙ্গে আরও কয়েকজন। ব্রাহ্মভক্ত। বৃহস্পতিবার, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২।

বিজয়ের প্রশ্নঃ "মহাশয়! কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হয়ে আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না?'

শ্রীরামকৃষ্ণঃ 'জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

"এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না- মেঘ কেটে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় অহং বুদ্ধি যায় তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

"জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

"জ্ঞানলাভ হলে অহঙ্কার যেতে পারে। জ্ঞানলাভ হলে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হলে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।

" বেদে আছে যে, সপ্তভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়। সমাধি হলেই অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিন ভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি – সেই তিন ভূমি। তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে কামিনী কাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয় তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়। যে ব্যক্তি জ্যোতিঃ দর্শন করে বলে 'এ'কি!' 'এ'কি!' 'এ'কি!' তারপর কন্ঠ। সেখানে যখন মনের বাস হয়। তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা শুনিতে ও কহিতে ইচ্ছা হয়। কপালে ভ্রুমধ্যে মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দ রূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন, স্পর্শ করতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু পারে না। লন্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পষ্ট হয় না; ছুঁই ছুঁই বোধ হয় কিন্তু ছোঁইয়া যায় না। সপ্তম ভূমিতে মন যখন যায় তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয়।"

মনের এই সপ্তভূমিই হল সহস্রার আশ্রয়। এখানে শিব শক্তির মহামিলন। এই মিলনক্ষেত্রেই ব্যক্তির জীবচৈতন্য মিশে যায় ঐ অসীম ভাগবতী চৈতন্য নিজস্বতা তার বজায় থাকে। যেমন চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট, ইত্যাদি। অথচ তার নিজের জীবনের উপর কর্তৃত্বের বোধ যায় লোপ পেয়ে। নিজ জীবনটি হয়ে ওঠে একটি অনন্ত কালপ্রবাহের একটি ক্ষণকাল মাত্র। অথবা অনন্ত এক অগ্নি শিখা থেকে উদ্ভূত এক স্ফুলিঙ্গ, জীবন যেন এক ধারাবাহিক মহাজীবনের একটি অনিবার্য অংশ হয়ে অনাবিল জীবন স্রোতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। তাই জীবন হয়ে যায় রূপান্তর। আগের জীব প্রকৃতির প্রভাব বা অধিকার থেকে মুক্ত হয়ে এখন ভাগবতী প্রকৃতির হয়ে ওঠে। জীব প্রকৃতির এই প্রভাব বা অধিকার চেতন যাত্রার যে প্রাথমিক তিনটি মনস্তরের কথা ঠাকুর বলেছেন ওখানেই নিবদ্ধ থাকে। তাহলে চেতন মুক্তি কেমন করে হবে যদি না যে নিজ চেতন সম্ভারকে ঐ চেতন সাগরে নিয়ে আসে।

ভগবানকে যখন দেখতে ইচ্ছা করে, জানতে ইচ্ছা করে, অনুভব করতে ইচ্ছা করে, জগতে পেতে ইচ্ছা করে, তখন সেটি পূরণ হয়ে ওঠে। পূরণ করবার আকাঙ্খা ও অভীপ্সা যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন হতে পারে ঐ অনুকুল অবস্থা। জীবের ভগবৎ দর্শন আকাঙ্খা আর সে সঙ্গে তার নিজ প্রস্তুতি সমন্বিত হয়ে অনুকুল বাতাবরণ ও অনুকুল পরিস্থিতির রচনা হয়ে যায়। জীবের পক্ষে এই আনুকূল্যের স্রোতে ভেসে গিয়ে ব্রহ্মদ্বার প্রান্তে উপস্থিত হতে পারাটিই তখন অভিপ্রেত হয়ে ওঠে।

ব্রহ্মপথ সহজ সরল। ব্রহ্মপথ আবার অত্যন্ত জটিল, দূরহ। ব্রহ্মপথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মনের যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, সেটি মনকেই করে পরিবর্তিত। মনের চরিত্র, স্বভাব বদল হয়ে যায়। মন জগৎ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবার অবস্থাতেই জগতের প্রভাব অতিক্রম করে যায়। বিপুল জনসংখ্যার ভিড়ের মধ্যেও সে একাকী হয়ে বিচরণ করতে পারে। জগতের সব কাজের মধ্যে থেকেও সে ঐ কাজের যে ফলজনিত প্রভাব তাকে অতিক্রম করে যেতে পারে। জগতের সব বিচিত্র বস্তু সমাবেশ, জগতের রূপ-রস-গন্ধ সবই থাকে আবার এ সবের মধ্যে থেকেও ঐ রূপ রস গন্ধকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে। প্রকৃতির সব বৈচিত্রের সমাবেশ দেখে মনোহর, মনমুগ্ধকারী সব সৌন্দর্য ও উপোভোগ্য বস্তু জগতের এই মনকে বিচলিত করে, বা করতে পারে। যখন হয় মনের রূপ বদল, এসব প্রভাব তখন ক্ষণ হয়ে যায়। রূপবদল ঘটতে পারে তীব্র ভগবৎ ভক্তি, তীব্র ভাগবতী ভালবাসা অথবা গভীর ধ্যান তন্ময়তার নিমজ্জিত হয়ে জগতের সব উপাদানের উপর থেকে মনের সংযোগ সরিয়ে দেয়। মনের এই ক্ষণে যে দ্যোতনা প্রধান হয়ে ওঠে তার মধ্য থেকে বাহ্য বিষয় দূরে সরে। মন বাইরের সব বিষয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অভ্যন্তরের জগতে বাস করতে থেকে। মনের এখন গতি অভ্যন্তরে। নিজ চেতনের গভীর প্রদেশে মন এখন ভগবানকে উপলব্ধি করতে চায়। মন তৎপর হয় অন্তরের অন্তঃস্থলে নিরন্তর দৃষ্টিযোগে যুক্ত হয়ে থাকতে। নিরন্তর অভ্যন্তরে যুক্ত হয়ে থাকবার যে স্বভাব ও চরিত্র তার গড়ে ওঠে ওই স্বভাব এবং চরিত্র পূর্বতন অবস্থা থেকে বহুভাবে স্বতন্ত্র। মনের স্বাভাবিক গতি, স্বাভাবিক  দৃষ্টি এসবই বদল হয়ে যায়। সকল বাহ্য প্রভাব থেকে একদিন মুক্ত হয়ে মন সোজা ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রয়াসী হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় মনটিকে আর সাধারণ বা স্বাভাবিক মানব মন বলা যাবে না। এর মধ্যে দৈবী স্বভাব ও দৈবী চরিত্রের প্রবেশ ঘটবার দরুন মনের হয়ে যায় দৈবীভাব। এটির পরিণাম একটি দৈবী মন। দৈবী মন ভগবান ছাড়া অন্য দিকে যায় না। দৈবী মন ভগবানে নিষিদ্ধ থাকে। এটি বিষয়ের দিকে, জগতের মান, যশ, অর্থ, প্রতিষ্ঠার দিকে না তাকিয়ে ভগবানের দিকেই শুধু তাকিয়ে থাকে। এই বিশ্বের সব মনোরম বস্তু, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠ যশ, শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বিপুল অর্থসম্ভার সবই হয়ে ওঠে তুচ্ছ। ভগবানই প্রধান ও একমাত্র হয়ে ওঠে।

ঈশান নিমন্ত্রন করে এনেছেন ঠাকুরকে। ঠন্ঠনিয়ার বাড়ীতে। শশধর পন্ডিত ছাড়াও আরও অনেকে উপস্থিত। এসেছে নরেন্দ্র। ঠাকুর আলাপ করছেন। বলছেনঃ

"বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল – এসব হিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। তাঁতে ভক্তি, প্রেম হবার জন্যই মানুষ জন্ম। তুমি আম খেয়ে চলে যাও। .....

"তাই বলছি, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও!"

"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজনে পাবি রে প্রেম রত্নধন।
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ।।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙে, চালায় আবার সে কোন জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরন।।

"এ সাগরে ডুবলে মরে না  - এ যে অমৃতের সাগর।

"আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম – ঈশ্বর রসের সমুদ্র, তুই এ সমুদ্রে ডুব দিবি কিনা বল্। আচ্ছা, মনে কর খুলিতে এক খুলি রস রয়েছে আর তুই মাছি হয়েছিস্। কোথা বসে রস্ খাবি বল্? নরেন্দ্র বললে, 'আমি খুলির আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাবো! কেননা বেশি দূরে গেলে ডুবে যাব!' তখন আমি বল্লাম, 'বাবা, এ সচ্চিদানন্দ সাগর এতে মরণের ভয় নাই, এ

সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নাই। ঈশ্বর প্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? তাই তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দ সাগরে মগ্ন হও।"

"অমৃত সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে হউক এ সাগরে পড়তে পারলেই হল। মনে কর অমৃতের একটি কুন্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে; তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড় অথবা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমাকে ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক। একই ফল। একটু অমৃতের আস্বাদন করলেই অমর হবে।

"অনন্ত পথ – তার মধ্যে জ্ঞান কর্ম, ভক্তি – যে পথ দিয়ে যাও, আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে।"

আজ নৌকাবিহার। কেশব সেনের জাহাজে যেতে আমন্ত্রণ। শুক্রুবার, ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২। ঠাকুর নিজের ঘরে ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ হরলাল রয়েছেন ঘরে। কথা হচ্ছে। কেশবের লোক এসে তাকে নৌকাবিহারের আমন্ত্রণ দিলেন। জাহাজে করে এসেছেন কেশব সেন। ঠাকুর নৌকায় গিয়ে জাহাজে উঠবেন। জাহাজ থেকে কেশবচন্দ্র দেখছেন নৌকায় ঠাকুর বাহ্যশূন্য, সমাধিস্থ। এসেছেন ঘরে। একটু প্রকৃতিস্থ। তিনি বলছেনঃ

"তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থল। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানেই থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি তার অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

"বন্ধন আর মুক্তি, দুয়ের কর্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব, কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনি 'ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী'।.....

শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)।
(ঐযে) আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।।
কাক গন্ডি মন্ডি গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা কারিগিরি বাড়াবাড়ি।।
বিষয়ে মজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।।
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্রপারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি।।

তিনি লীলাময়ী! এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।"

ভগবানকে ভাবনা করতে পারা সাধনার একটি পর্ব। তাঁর ভাবনা করতে করতে ক্রমে একটি সময় আসে যখন ঐ ভাবনাটির বিষয়বস্তু বাস্তবই হয়ে ওঠে। যে সব সময়ে নিজের কৃত কর্মের আবর্তে বদ্ধ হয়ে থাকে তার মুক্তি হয়ে ওঠে সুদূর পরাহত। 'পাপী' হিসেবে নিজেকে ভাবনা যত করতে থাকবে ততই নিজের মধ্যে নিম্নগামী চিন্তা রাজি সব বাসা বাধতে থাকে। পাপের আবর্ত নানা দিক থেকে এসে আক্রমন করতে তৎপর হতে থাকে। অন্যদিকে ভাবনায় যদি মুক্তির আবর্ত চলে আসে। ক্রমে সেটি প্রত্যয়ের ভূমি পায়। 'আমি মুক্ত' এই ভাবনা ক্রমে মুক্তির পরিবেশ ও পটভূমি সৃষ্টি করে। মুক্তির ভাবনা, মুক্তির আকাঙ্খা সৃষ্টি করে। মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় মুক্তির পরিবেশ। মুক্তির পথেই এগিয়ে চলতে তৎপর হয় জীবন। জগতের, সংসারে কালিমা ধুয়ে যায় ক্রমে। জীবন হয়ে ওঠে শুভ্র, মুক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ

“সত্য বল্‌ছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতেহবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

“মন নিয়ে কথা, মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপ্‌বে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজে রঙে ছোপাও সবুজ। যে রঙে ছোপাও সে রঙেই ছুপ্‌বে।.....

“কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশি কর্ম চলে না। ... কলিযুগে ভক্তিযোগে, ভগবানের নাম গুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগেই যুগধর্ম।...

নরেন্দ্র এসেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলছেনঃ

“বেদে আছে হোমাপাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখি থাকে। সেই আকাশে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিম্‌টা পড়তে থাকে – কিন্তু এত উঁচু যে, অনেকদিন থেকে ডিমটা পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফূটলেই সে দেখতে পায় যে সে পড়ে যাচ্ছে। আর মাটিতে লাগলে একবারে চুরমার হয়ে যায়। তখন সে পাখি মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়। আর উঁচুতে উঠে যায়।”

মহাকালীর কৃপার রথে ব্রহ্মলাভ জগৎ পথেই।